লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Fortnightly Ahmadi
Since 1922

নবপর্যায় ৮৪ বর্ষ | ১১ম সংখ্যা

প্রকাশনার ৯৯ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ | ১০ জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৩ হিজরি | ১৫ ফাতাহ্, ১৪০০ হি. শা. | ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ ঈসাব্দ

গায়ের আহমদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাবধান বাণী

খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের জামা'তের সদস্য সংখ্যা যেহেতু অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বর্তমানে তা হাজার হাজারে গিয়ে উপনীত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা অচীরেই লক্ষ-তে পৌছে যাবে। (এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় তা কোটিতে উপনীত হয়েছে) তাই হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবি হল, এদের পারস্পরিক ঐক্য বৃদ্ধি করার জন্য, এবং এদের পরিবার পরিজন আর আত্মীয় স্বজনের মন্দ বা কুপ্রভাব থেকে আর মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য ছেলে-মেয়েদের বিবাহের বিষয়ে কোন উত্তম ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন।

এ কথা স্পষ্ট, যারা বিরোধী মৌলবীদের প্রভাবে বা ছত্রছায়ায় বিদ্বেষ, হিংসা আর কার্পণ্য এবং শত্রুতার চরম সীমায় উপনীত, যতদিন তারা তওবা করে এই জামা'তে অন্তর্ভূক্ত না হয়, ততদিন তাদের সাথে আমাদের জামা'তের সদস্যদের নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর এ জামা'ত সম্পদে, জ্ঞানে, কল্যাণে, বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে, পুণ্যের দিক দিয়ে কোন ক্ষেত্রেই এখন তাদের মুখাপেক্ষী নয়, এমনকি তাকওয়া পরায়ণ অসংখ্য লোক এ জামা'তে বিদ্যমান। আর প্রত্যেক ইসলামী গোষ্ঠীর লোক এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এমন কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না– যারা আমাদেরকে কাফের বলে, আমাদেরকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দেয় অথবা নিজেরা না বললেও এমন বক্তব্য প্রদানকারীদের গুণগান করে এবং তাদের অনুগামী।

স্মরণ রাখবেন! যারা এমন লোকদের পরিত্যাগ করতে না পারে, তারা আমাদের জামা'তে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য নয়। যতদিন পর্যন্ত পবিত্রতা ও সত্যের জন্য এক ভাই নিজ ভাইকে পরিত্যাগ করতে না পারে, পিতা নিজ পুত্র থেকে পৃথক হতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। অতএব সমস্ত জামা'ত মন দিয়ে শুনুন! সত্যনিষ্ঠ হবার জন্য এ শর্ত মানা আবশ্যক।

(মজমুআয়ে ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা: ৫০-৫১)

সম্পাদকীয়

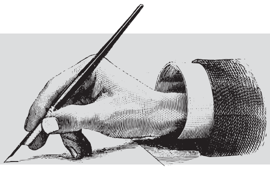

ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ্

এ পৃথিবীতে মানুষ ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধনসম্পদ ব্যয় করে; আর কোন কোন সময় সে সদকা-খয়রাতও করে এবং জনহিতকর কাজও করে। কিন্তু পৃথিবীতে আজ এমন কোন জামা'ত বা এমন কোন দল নেই, যার সদস্য এবং ব্যক্তিরা পৃথিবীর সকল শহর ও সকল দেশে এক লক্ষ্যে, এক নেতৃত্বের অধীনে নিজেদের ধনসম্পদ ধর্মের প্রচার ও সৃষ্টির সেবায় ব্যয় করছে। হ্যাঁ! আজকে ধরাপৃষ্ঠে একটিমাত্র জামা'ত আছে যার সদস্যরা এই কাজ করে চলেছে আর সেটি রসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসের জামা'ত; এটি সেই জামা'ত যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীর জামা'ত– যার ওপর সারাবিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এই জামা'ত বিগত প্রায় ১৩০ বৎসর ধরে ইসলাম এবং মানবতার সেবার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে চলেছে। আর এর কারণ হল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ জামা'তকে কুরআনের শিক্ষার আলোকে ধনসম্পদের সঠিক ব্যয়স্থল এবং ধনসম্পদ কুরবানীর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি দান করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, আমি বারবার জোর দেই যে, খোদা তা'লার পথে সম্পদ ব্যয় কর– এটি আমি খোদা তা'লার নির্দেশে করি, খোদার নির্দেশে আমি এই নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা ইসলাম এখন ক্রমশ অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয়েছে। এর বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দেখে আমি ব্যাকুল হয়ে যাই। ইসলাম বিভিন্ন বিরোধী ধর্মের দুর্বল শিকারে পরিণত হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, যেখানে পরিস্থিতি এমন, সেখানে ইসলামের উন্নতির জন্য আমরা কি কোন পদক্ষেপ নেব না? খোদা তা'লা এ উদ্দেশ্যেই এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন; খোদা তা'লা এ উদ্দেশ্যেই এ জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব, এর উন্নতির জন্য খোদার ইচ্ছার অনুগমন করে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া খোদার নির্দেশ। তিনি (আ.) বলেন, এসব প্রতিশ্রুতিও খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই– যে ব্যক্তি খোদার পথে, খোদার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করবে, আমি (খোদা তা'লা) তা বহুগুণ বর্ধিত করব; পৃথিবীতেই সে অনেক কিছু পাবে, আর মৃত্যুর পর পারলৌকিক প্রতিদানও সে দেখবে। তিনি (আ.) বলেন, আমি এখন এ বিষয়ের দিকে তোমাদের সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, ইসলামের উন্নতির জন্য নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় কর। *(মালফুযাত, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৩-৩৯৪)*

এক দরিদ্র জামা'ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম প্রচার এবং মানবসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছি আর আমাদের কাজে আল্লাহ্ তা'লা এত অসাধারণ কল্যাণ এবং বরকত রেখে দেন যা দেখে পৃথিবীর মানুষ আশ্চর্য হয় যে, এত সীমিত উৎসের বা সাধ্যের মাঝে এরা এত কাজ কীভাবে সাধন করতে পারে? এটি এজন্য সম্ভব হচ্ছে যে, এ সমস্ত ত্যাগী ব্যক্তিরা তারা, যারা সেসব লোকের মধ্যে গণ্য হওয়ার চেষ্টা করেন, যাদের দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ তা'লা এভাবে দিচ্ছেন যে, **ইয়ুনফিকূনা আমওয়ালাহুমুবতিগাআ মারাযাতিল্লাহ্–** তারা নিজেদের ধনসম্পদ খোদার সন্তুষ্টি সন্ধানে ব্যয় করে; আর খোদার সন্তুষ্টি প্রকৃত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে তাহলে, যে ফল লাভ হয়, তা-ও অনেক বেশি আর যে কল্যাণ সে বয়ে আনে তা-ও অনেক বেশি।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইসলামের উন্নতির জন্য নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় যথাসাধ্য ব্যয় করার সৌভাগ্য দিন।

সূচিপত্র

১৫ ডিসেম্বর ২০২১

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

১৫ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৬
বিষয়: ***হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা***

২২ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ১৫
বিষয়: ***হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর স্মৃতিচারণ***

সীরাতুল মাহদী (আ.) ২৬
[হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]
প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)
ভাষান্তর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর পবিত্র জীবনচরিত এবং জামা'তের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপদেশাবলী ২৮
মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের

বিজয়ের মাস ও ইসলামের দৃষ্টিতে স্বদেশ প্রেম ৩২
মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন

কবিতা: ৩৭
ভ্রম
মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম মণি

সংবাদ ৩৮

শোক সংবাদ ৪১

ময়মনসিংহ ও সোহাগী জামা'ত সফর করে এলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ মোহতরম আলহাজ্জ আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ৪২

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৪৪

প্রচ্ছদ পরিচিতি:
জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতি
ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

কুরআন শরীফ

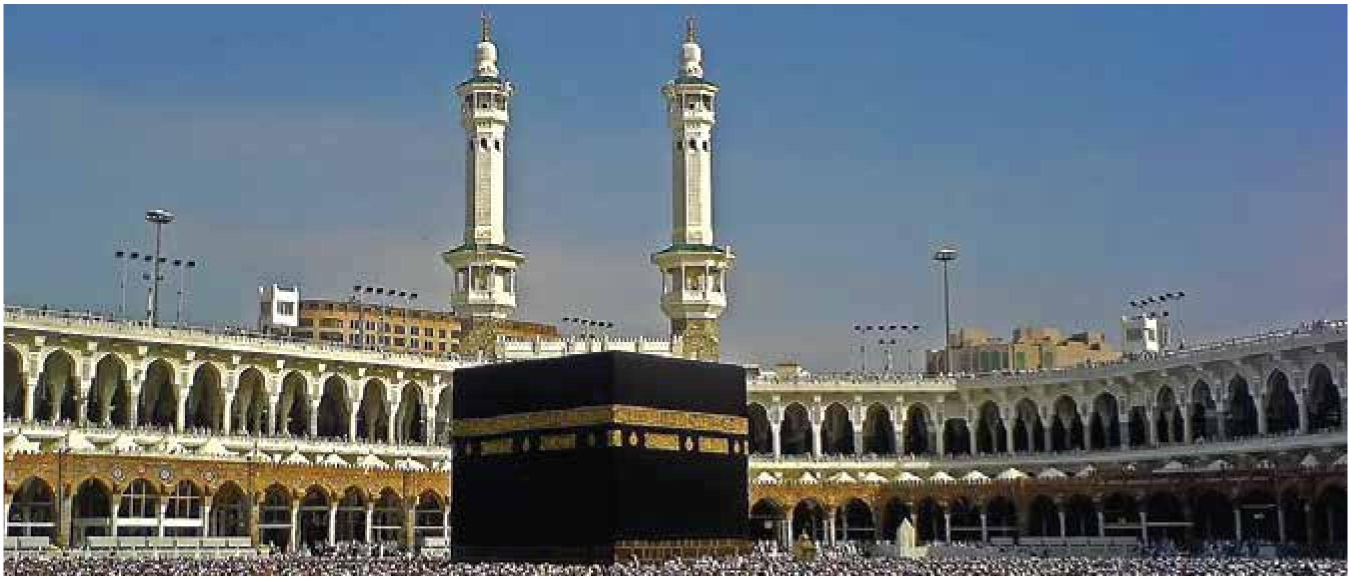

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَمَثَلُ الَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَہُمُ ابۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ اللّٰہِ وَتَثۡبِیۡتًا مِّنۡ اَنۡفُسِہِمۡ کَمَثَلِ جَنَّۃٍۭ بِرَبۡوَۃٍ اَصَابَہَا وَابِلٌ فَاٰتَتۡ اُکُلَہَا ضِعۡفَیۡنِ ۚ

فَاِنۡ لَّمۡ یُصِبۡہَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰہُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌ ﴿۲۶۶﴾ *(সূরা আল বাকারা: ২৬৬)*

অনুবাদঃ যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সন্ধানে এবং নিজেদের কতকের দৃঢ়তার জন্য ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত উঁচু স্থানে অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায় যার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলে দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে এবং যদি তাতে প্রবল বৃষ্টিপাত না-ও হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট; আর তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ্ সে বিষয়ের সম্যক দ্রষ্টা’।

তফসীর

খাঁটি ঈমান, সত্যিকার পুণ্য এবং উন্নতমানের কুরবানীর পরিচয় তখন পাওয়া যায় যখন এমন জিনিস ব্যয় করা হয় যা সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়। ঈমানের দৃঢ়তা ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে একজন মু’মিন সর্বপ্রকার কুরবানীর জন্য সদা প্রস্তুত থাকে, আর থাকা উচিত। পুণ্যকর্মের উন্নত মানে উপনীত হওয়ার জন্যও একজন সত্যিকার মু’মিন সর্বদা ব্যাকুল থাকে। হাদীস শরীফে আছে, ‘যখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন হযরত আবু তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ (খেজুরবাগান) বেয়রোহা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিলাম। হুযূর (সা.) এতে খুবই আনন্দিত হন। *(বুখারী, কিতাবুত তাফসির, হাদীস নম্বর ৪৫৫৪)*

মোটকথা সাহাবীরা সবসময় অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকতেন, কখন আমরা ঈমান, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও ত্যাগের বহিঃপ্রকাশের সুযোগ পাব! আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়কারীদেরকে মহানবী (সা.) পরম ভাগ্যবান বা ঈর্ষণীয় আখ্যা দিয়েছেন। আমরা সাহাবাদের মাঝে এমন অগণিতকে এই মান অর্জনকারী হিসেবে দেখতে পাই– যাঁরা গোপনেও আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করতেন আবার প্রকাশ্যেও। দৃষ্টির আড়ালে খরচ করতেন আবার জনসমক্ষেও, যেন সেই উচ্চ মান লাভ করা যায় যা একজন মু’মিনের কাছে আল্লাহ্ প্রত্যাশা করেন। আল্লাহ্ তা’লা তাঁদের ত্যাগ বা কুরবানীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও জানতেন আর তাই তিনি তাঁদের দিয়েছেনও অঢেল। যাঁরা সামান্য ব্যবসা করতেন, তাঁদের এমন সময়ও এসেছে যখন আল্লাহ্ কোটিপতি বানিয়ে দিয়েছেন। আর এই আর্থিক প্রাচুর্য তাঁদের ঈমান ও বিশ্বাসকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছে। প্রাপ্ত এ অর্থ ও সম্পদ তাঁরা নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে আর নিঃশঙ্কচিত্তে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে গেছেন। তাঁরা খুব ভালভাবে জানতেন এবং ব্যুৎপত্তি রাখতেন যে, আল্লাহ্ তা’লার পথে খরচ করলে তিনি অঢেল দিয়ে থাকেন তথা সাতশত গুণ বরং আরও বেশি কেননা আল্লাহ্ তা’লা কারও কাছে ঋণী থাকেন না।

হাদীস শরীফ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِي قَالَ "لاَ". قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ "لاَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا

(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং: ৪০৬৩)

হযরত সা'দ (রা.) বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় মহানবী (সা.) আমাকে দেখতে আসেন এমন সময় যখন আমি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলাম। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! রোগের কারণে আমার যে কী অবস্থা তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আমি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি অথচ একটি মাত্র কন্যা ব্যাতিত আমার আর কোন ওয়ারিশ নেই। তাই আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ (আল্লাহ্‌র পথে) দান করতে পারি? তিনি (সা.) বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক সম্পদ (আল্লাহ্‌র পথে) দান করতে পারি? তিনি (সা.) বললেন, না বরং তুমি এক-তৃতীয়াংশ দান কর এবং এক-তৃতীয়াংশই অনেক। তোমার ওয়ারিশদের অভাবগ্রস্ত রেখে বিদায় নেয়ার চেয়ে অভাবমুক্ত রাখাই শ্রেয়, অন্যথায় তারা লোকদের কাছে হাত পাতবে। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা-ই ব্যয় করবে, তদনুযায়ী তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বহু স্থানে তাঁর পথে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি বলা হয়েছে, নিজ প্রিয় সম্পদ ব্যয় না করা পর্যন্ত কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকে নিজ সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে মনস্থ করতে পারে। এক্ষেত্রে ইসলাম ভারসাম্য রক্ষার শিক্ষা দেয় যা উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় তথা নিজ সম্পদের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং উত্তরাধিকারীদের রিক্তহস্ত না করে সাবলম্বী রেখে যেতে বলা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ জামা'তের জন্য ঐশী আদেশে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামের এই শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে। **অতএব যারা এখনও ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আশু উক্ত ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য দিন।**

অমৃতবাণী

আল্লাহ্‌র পথে প্রিয় সম্পদ ব্যয় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"অপ্রয়োজনীয় ও বাজে জিনিস ব্যয় করে কোন ব্যক্তি পুণ্য কর্ম করেছে বলে দাবী করতে পারে না। পুণ্যের দ্বার খুবই সংকীর্ণ। অতএব এ বিষয়টি ভালভাবে মনে রেখ, অপ্রয়োজনীয় জিনিস ব্যয় করে কেউ সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "লান তানালূল বির্‌রা হাত্‌তা তুনফিকূ মিম্মা তুহিব্বূন" (আলে-ইমরান: ৯৩) অর্থাৎ যতক্ষণ তুমি তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করবে ততক্ষণ আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। যদি কষ্ট করতে না চাও এবং প্রকৃত পুণ্য লাভ করতে না চাও তাহলে সফল হবে কীভাবে? সাহাবীরা (রা.) কি এমনিতেই সেই মর্যাদায় উপণীত হয়েছিলেন? জাগতিক উপাধি লাভ করার জন্য কত অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং কত কষ্ট সহ্য করতে হয় আর অবশেষে একটি সামান্য উপাধি লাভ হয় যদ্বারা হৃদয়ের প্রশান্তিও লাভ হয় না। অথচ 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম' উপাধি হৃদয়কে প্রশান্তি প্রদানকারী এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের চিহ্ন। তা কি এমনিতেই লাভ হতে পারে? অতএব আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিই হল প্রকৃত সুখের কারণ আর তা ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ হতে পারে না যতক্ষণ জাগতিক কষ্ট সহ্য করা না হয়। তারাই কল্যাণমণ্ডিত যারা ঐশী সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দুঃখকষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না কেননা চিরস্থায়ী সুখ এবং চিরস্থায়ী আনন্দ জাগতিক দুঃখকষ্ট সহ্য করেই লাভ হয়।" *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৫-৭৬)*

তিনি (আ.) একদা এক বৈঠকে বলেন: "স্বপ্নের তা'বীর সম্বলিত পুস্তকে লেখা আছে, কোন ব্যক্তি স্বপ্নে যদি নিজ কলিজা বের করে কাউকে দিতে দেখে তবে এর তা'বীর হল, অর্থসম্পদ প্রদান করা। এ কারণেই প্রকৃত তাকওয়া এবং প্রকৃত ঈমান লাভ করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, **"লান তানালূল বির্‌রা হাত্‌তা তুনফিকূ মিম্মা তুহিব্বূন"** (আলে-ইমরান: ৯৩) তথা আল্লাহ্‌র পথে নিজ প্রিয় সম্পদ ব্যয় না করে কেউ প্রকৃত পুণ্য লাভ করতে পারবে না।" *(মালফুযাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৫-৯৬)*

১৫ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:

হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনা গত খুতবায় বর্ণিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে বর্ণনা করার মত আরও কিছু কথা রয়েছে। সহীহ্ বুখারীর যে রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করা হয়েছিল তা থেকে এটি বুঝা যায় যে, হযরত উমর (রা.)-এর ওপর আক্রমণের অব্যবহিত পরেই ফজরের নামায পড়ে নেয়া হয়েছিল আর হযরত উমর (রা.) তখন মসজিদেই ছিলেন যেখানে কিনা অন্যান্য রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাৎক্ষণিকভাবে হযরত উমর (রা.)-কে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় আর নামায পরে আদায় করা হয়। যেমনটি সহীহ্ বুখারীর ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইবনে হাজর এই রেওয়ায়েতের নিচে অপর একটি রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন হযরত উমর (রা.)-এর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে থাকে আর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন তখন আমি মানুষের সাহায্য নিয়ে তাঁকে ঘরে পৌঁছে দেই। প্রভাতের আলো পরিষ্কারভাবে ফুঁটে উঠা পর্যন্ত তিনি অচেতন ছিলেন। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, মানুষ কি নামায পড়ে নিয়েছে? তখন আমি নিবেদন করি, জ্বী হ্যাঁ! তখন তিনি বলেন, তার ইসলাম ইসলাম নয় যে নামায পরিত্যাগ করেছে। এরপর তিনি ওযু

করেন এবং নামায পড়েন। *(ফাতহুল বারী, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৪, শারাহ্ হাদীস নম্বর: ৩৭০০, দারুল মা'রেফা, বৈরুত)* *(আত-তাবাকাতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত ১৯৯০)*

এছাড়া তাবাকাতে কুবরাতেও এটিই বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)-কে তুলে বাড়িতে পৌঁছানো হয় আর হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) নামায পড়ান। সেইসাথে এটিও উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আব্দুর রহমান (রা.) পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ছোট্ট দুটি সূরা إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এবং وَالْعَصْرِ পাঠ করেন। অন্যত্র قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ এবং وَالْعَصْرِ পড়ার উল্লেখ রয়েছে। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত ১৯৯০)*

হযরত উমর (রা.)-এর ঘাতকের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাবাকাতে কুবরাতে লেখা হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)-এর ওপর আক্রমণ হলে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.)-কে বলেন, যাও এবং খোঁজ নাও যে, কে আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছে? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি বের হই এবং ঘরের দরজা খুললে মানুষকে সমবেত দেখতে পাই, যারা হযরত উমর (রা.)-এর অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, কে আমীরুল মু'মিনীনকে খঞ্জরাঘাত করেছে? তারা বলে, আল্লাহ্‌র শত্রু আবু লুলু তাঁকে খঞ্জর মেরেছে, যে মুগীরা বিন শো'বা-র ক্রীতদাস। সে আরও লোককে আহত করেছে, কিন্তু যখন ধরা পড়ে তখন সেই একই খঞ্জর দিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত ১৯৯০)*

হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাত কি কোন ষড়যন্ত্রের ফলাফল ছিল নাকি সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল–

এ সম্পর্কে পরবর্তী কালের কতিপয় ঐতিহাসিক এটিও লিখেছেন যে, হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের কারণ কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নয়, বরং এটি এক ষড়যন্ত্র ছিল। যাহোক আমরা দেখি যে, তাদের মতামত হল, হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায় বীর খলীফাকে যেভাবে শহীদ করা হয়েছে, সাধারণত আমরা দেখি যে, ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারগণ শাহাদতের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করার পর নীরব হয়ে যান। এতে এই ধারণা জন্মে যে, আবু লুলু ফিরোয এক সাময়িক উত্তেজনা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাঁকে হত্যা করেছিল। কিন্তু বর্তমান কালের কতিপয় ঐতিহাসিক ও জীবনীকার এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এটি নিছক এক ব্যক্তির ক্রোধের কারণে ঘটিত প্রতিশোধমূলক কাজ হতে পারে না, বরং এটি এক ষড়যন্ত্র ছিল আর রীতিমত পূর্বপরিকল্পিত এক ষড়যন্ত্রের অধীনে হযরত উমর (রা.)'কে হত্যা করা হয়েছিল। আর প্রসিদ্ধ ইরানি সেনাপতি হুরমুযান, যে কিনা তখন বাহ্যত মুসলমান হয়ে মদিনায় বসবাস করছিল, সে-ও এই ষড়যন্ত্রে অংশীদার ছিল। বর্তমান কালের এসব লেখকরা প্রাচীন ঐতিহাসিক ও জীবনীকারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, এটি যে একটি ষড়যন্ত্র ছিল, এ মর্মে তারা কেন গুরুত্বপূর্ণ এই হত্যার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন নি?

যদিও ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া'-তে কেবল এতটুকু পাওয়া যায় যে, সন্দেহ করা হয়, হযরত উমর (রা.)-এর হত্যার পেছনে হুরমুযান এবং জুফাইনার হাত ছিল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্)

অতএব এই সন্দেহের ভিত্তিতেই হযরত উমর (রা.)-এর জীবনীকার বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে এটিকে রীতিমত এক ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়েছেন।

এই লেখকদের মধ্য থেকেই একজন মুহাম্মদ রেযা সাহেব নিজ পুস্তক 'সীরাত উমর ফারুক'-এ লিখেন, হযরত উমর (রা.) কোন প্রাপ্তবয়স্ক যুদ্ধবন্দীকে মদিনায় আসার অনুমতি প্রদান করতেন না। এমনকি কূফার গভর্নর হযরত মুগীরা বিন শো'বা, তাঁর নামে একটি পত্র লিখেন যে, তার কাছে একজন ক্রীতদাস রয়েছে, যে খুবই কুশলী আর তিনি তাকে মদিনায় নিয়ে আসার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা.) বলেন, সে অনেক কাজ জানে যাতে মানুষের কল্যাণ হবে। সে কামার, কারুকার্যে দক্ষ, কাঠমিস্ত্রির কাজও জানে। হযরত উমর (রা.) হযরত মুগীরার নামে পত্র লিখেন এবং তিনি তাকে মদিনায় প্রেরণের অনুমতি প্রদান করেন। হযরত মুগীরা তার জন্য মাসিক একশত দিরহাম কর নির্ধারণ করেন। সে হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং অভিযোগ করে যে, তার ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন কোন কাজ ভালভাবে করতে পার? সে তাঁকে সেসব কাজের কথা বলে যেগুলোতে সে খুবই দক্ষ ছিল। হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার কাজের দক্ষতার নিরিখে তোমার কর খুব একটা বেশি নয়। সে তখন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়। স্বল্পকাল পর একদিন সেই একই ক্রীতদাস হযরত উমর (রা.)-এর পাশ দিয়ে গেলে তিনি তাকে ডেকে বলেন, আমি জানতে পেরেছি, তুমি বায়ুচালিত চাক্কি খুব ভাল বানাতে পার। সেই ক্রীতদাস ক্রোধ এবং ঘৃণার সাথে হযরত উমর (রা.)-এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং বলে, আমি আপনার জন্য এমন এক চাক্কি বানাব যে, মানুষ তা সম্পর্কে বলাবলি করে বেড়াবে। সেই ক্রীতদাস যখন ফিরে যায় তখন তিনি (রা.) তাঁর সাথে থাকা সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, এই ক্রীতদাস এইমাত্র আমাকে হুমকি দিয়েছে। কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবু লুলু নিজ চাঁদরে লুকিয়ে রাখা দু'ধারী চাকু দ্বারা

হযরত উমর (রা.)-এর ওপর আক্রমণ করে যার বাট তার হাতে ছিল, যেমনটি শাহাদতের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। তার একটি আঘাত নাভির নীচে লেগেছিল। একদিক থেকে হযরত উমর (রা.)-এর প্রতি আবু লুলু'র বিদ্বেষ এবং ঘৃণাও ছিল, কেননা আরবরা তার অঞ্চল জয় করে নিয়েছিল এবং তাকে যুদ্ধবন্দি বানিয়েছিল আর তার বাদশাহ্‌কে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল। সে যখনই যুদ্ধবন্দি কোন ছোট্ট শিশুকে দেখত, তখন তাদের কাছে গিয়ে তাদের মাথায় হাত বুলাত এবং কেঁদে কেঁদে বলত, আরবরা আমার প্রিয়দের হত্যা করেছে। যখন আবু লুলু হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করার দৃঢ় সংকল্প করে, তখন সে খুব যত্নের সাথে দু'ধারী খঞ্জর বানায়, সেটিকে ধার দেয়, এরপর সেটিকে বিষাক্ত করে, অতঃপর তা নিয়ে হুরমুযান-এর কাছে যায় এবং বলে, এই খঞ্জর সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে বলে, আমার ধারণা হল, তুমি এর মাধ্যমে যার ওপরই আক্রমণ করবে, তাকে হত্যা করবে। হুরমুযান পারস্যবাসীদের সেনাপ্রধানদের একজন ছিল। মুসলমানরা তাকে তুসতার নামক স্থানে বন্দি করেছিল এবং মদিনায় প্রেরণ করেছিল। সে যখন হযরত উমর (রা.)-কে দেখে তখন জিজ্ঞেস করে, তাঁর দেহরক্ষী দারোয়ান কোথায়?– যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীগণ (রা.) বলেন, তাঁর কোন দেহরক্ষী নেই, কোন দারোয়ান নেই, কোন সেক্রেটারি নেই, কোন দরবারও নেই। তখন সে বলে, তাঁর তো নবী হওয়া উচিত। যাহোক, এরপর সে মুসলমান হয়ে যায় আর হযরত উমর (রা.) তার ভাতা দু' হাজার (দিরহাম) নির্ধারণ করেন এবং তাকে মদিনায় বসবাসের অনুমতি দেন।

তাবাকাত ইবনে সা'দ পুস্তকে নাফে'র বরাতে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে,

হযরত আব্দুর রহমান সেই ছুরি দেখেছিলেন যার মাধ্যমে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, আমি গতকাল এই ছুরিটি হুরমুযান ও জুফাইনার কাছে দেখেছিলাম, তখন আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে, তোমরা এই ছুরি দিয়ে কি কর? তখন তারা উভয়ে বলে, আমরা এটি দিয়ে মাংস কাটি, কেননা আমরা মাংস স্পর্শ করি না। এ কথা শুনে হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর হযরত আব্দুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি এই ছুরিটি তাদের দু'জনের কাছে দেখেছিলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। অতএব, হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর নিজ তরবারি হাতে তুলে নেন এবং উভয়ের কাছে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করেন। হযরত উসমান (রা.) হযরত উবায়দুল্লাহ্‌কে ডেকে পাঠান। যখন তিনি (অর্থাৎ উবায়দুল্লাহ্) তাঁর (অর্থাৎ হযরত উসমানের) কাছে আসেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, উক্ত দুই ব্যক্তিকে হত্যা করতে কোন বিষয়টি আপনাকে প্ররোচিত করেছে, যখন কিনা তারা দু'জনই আমাদের নিরাপত্তায় ছিল? এ কথা শুনতেই হযরত উবায়দুল্লাহ্, হযরত উসমান (রা.)-কে ধরে মাটিতে ফেলে দেন, এমনকি লোকজন এগিয়ে আসে এবং তারা হযরত উসমান (রা.)-কে, হযরত উবায়দুল্লাহ্‌র হাত থেকে রক্ষা করে। যখন হযরত উসমান (রা.) তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি অর্থাৎ হযরত উবায়দুল্লাহ্ তরবারি গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান (রা.) তাকে কঠোরভাবে বলেন যে, তুমি এটি (তরবারি) নামিয়ে রাখ, তখন তিনি তরবারি নামিয়ে রাখেন। এ রেওয়ায়েতটি অর্থাৎ, হযরত উসমান (রা.)-কে ভূপাতিত করা সংক্রান্ত ঘটনা কতটুকু সঠিক তা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন।

সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়, হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি বকর বলেন, আমি হযরত উমর (রা.)-এর ঘাতক আবু লুলু'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে জুফাইনা এবং হুরমুযানও তার সাথে ছিল আর তারা ফিসফিস করে কথা বলছিল। আমি আচমকা তাদের কাছে পৌঁছলে তারা দৌড়ে পালাতে আরম্ভ করে আর একটি ছুরি তাদের মাঝে পড়ে যায়। এর দুটি ফলা ছিল, আর এর বাট ছিল মাঝখানে। একটু দেখ, যে ছুরি দিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছে সেটি কেমন ছিল? অতএব তারা দেখল যে, সেই ছুরিটি হুবহু তেমনই ছিল যেমনটি হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি বকর বর্ণনা করেছিলেন।

হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর যখন হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি বকরের কাছে একথা শুনেন তখন তিনি তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, আর হুরমুযানকে ডাকেন। যখন সে (অর্থাৎ হুরমুযান) তার কাছে আসে তখন তিনি তাকে বলেন, আমার সাথে চল, আমরা আমার ঘোড়া দেখতে যাব, এবং নিজে তার পেছনে হাঁটতে থাকেন। যখন সে তার সম্মুখে হাঁটতে থাকে তখন তিনি তার (অর্থাৎ হুরমুযানের) ওপর তরবারি দিয়ে আঘাত করেন। হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর বর্ণনা করেন, যখন সে তরবারির তীক্ষ্ণতা অনুভব করে তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করে। হযরত উবায়দুল্লাহ্ বলেন, এরপর আমি জুফাইনাকে ডাকি। সে হীরার খ্রিস্টানদের মাঝে একজন খ্রিস্টান ছিল আর সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের সাহায্যকারী ছিল। তিনি তাকে চুক্তির অধীনে মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন যা কিনা তার ও জুফাইনা'র মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল। সে মদিনায় লেখা শেখাত। যখন আমি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করি তখন সে তার চোখের সামনে ক্রুশের চিহ্ন আঁকে। অতঃপর হযরত উবায়দুল্লাহ্ সামনে অগ্রসর হন এবং আবু লুলু'র কন্যাকেও হত্যা করেন, যে মুসলমান হবার দাবি করত। হযরত উবায়দুল্লাহ্‌র সংকল্প ছিল যে, আজ তিনি মদিনার বুকে কোন কয়েদি বা যুদ্ধবন্দিকে জীবিত রাখবেন না। মুহাজিররা তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে বাধা দেয় এবং তাকে সাবধান করে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করব আর তিনি মুহাজিরদেরও সমীহ করেন নি। এমনকি

হযরত আমর বিন আস (রা.) তার সাথে অনবরত কথা বলতে থাকেন যতক্ষণ না তিনি হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর কাছে তরবারি সমর্পণ করেন। অতঃপর হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) তার কাছে আসেন। তখন তারা দু'জন একে অপরের ললাটের চুল ধরে ফেলেন। মোটকথা তিনি হুরমুযান, জুফাইনা ও আবু লুলু'র কন্যাকে হত্যা করেন।

এখন সকল বিষয় এ বিতর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)-কে হত্যা করতে যে ব্যক্তি আবু লুলু'কে উস্কানি দিয়েছিল আর আমাদের কাছে যেসব রেওয়ায়েত রয়েছে– সেগুলো এই কথার প্রমাণ বহন করে যে, হযরত উমর (রা.)-এর হত্যা একটি (গভীর) ষড়যন্ত্র ছিল। এই লেখক লিখেছেন (এবং) যিনি এ কথার পক্ষে যে, এটি এক (পূর্বপরিকল্পিত) ষড়যন্ত্র ছিল। এসব ষড়যন্ত্রের হোতা ছিল হুরমুযান। সে হযরত উমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে আবু লুলু'র হিংসাবিদ্বেষ আরও উস্কে দেয়। তারা উভয়ে ছিল অনারব। এছাড়া হুরমুযানকে যখন বন্দী করা হয় এবং তাকে মদিনা প্রেরণ করা হয় তখন সে এই আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে যে, খলীফা তাকে হত্যা করবেন। তাবাকাত ইবনে সা'দ-এ নাফে'র রেওয়ায়েতে উল্লিখিত আছে যে, আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) সেই ছুরিটি দেখেছিলেন যেটি দিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল।

তাবারীতে ইবনে সা'দ–এ নাফের বর্ণনায় উল্লিখিত আছে যে, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সেই খঞ্জর দেখেছিলেন যেটি আবু লুলু, জুফাইনা এবং হুরমুযানের মাঝে পড়ে গিয়েছিল, ঘটনাক্রমে তিনি (তথা আব্দুর রহমান বিন আবু বকর) হঠাৎ তাদের কাছে এসেছিলেন। হাঁটার সময় সেটি পড়ে গিয়েছিল। উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর, হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকরের কাছে একথা শুনতেই তাদের উভয়ের কাছে যান এবং তাদেরকে হত্যা করেন। কেবল তাদের উভয়কে হত্যা করেই ক্ষান্ত হন নি বরং তিনি প্রতিশোধের স্পৃহার কাছে পরাস্ত হয়ে আবু লুলু'র কন্যাকেও হত্যা করেন। সেই খঞ্জরটি, যেটির বিষয়ে হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর বলেছিলেন, তা অবিকল সেটিই ছিল যেটি দিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল। হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর যদি হুরমুযান এবং জুফাইনা'কে হত্যা করার ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি না করতেন তাহলে তাদের উভয়কে ঘটনার তদন্তের জন্য ডাকা যেত এবং এভাবে ষড়যন্ত্রের রহস্য উন্মোচিত হত। এসব বিষয় যদি দৃষ্টিপটে রাখা হয় তাহলে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় বুঝা যায় যে, এটি ছিল ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত একটি ষড়যন্ত্র আর যে সেই ষড়যন্ত্রকে কার্যে পরিণত করেছিল এবং হযরত উমর (রা.)-কে হত্যা করেছিল সে ছিল আবু লুলু। এ হত্যাকে যারা ষড়যন্ত্র মনে করে এটি তাদের মত। *(সীরাতে উমর ফারুক, প্রণেতা– মুহাম্মদ রেজা, অনুবাদক– মুহাম্মদ সরোয়ার গওহর সাহেব, পৃষ্ঠা: ৩৪০-৩৪৪)*

এমনিভাবে আরেকজন জীবনীকার ড. মোহাম্মদ হোসেন হ্যায়কল নিজ পুস্তকে লিখেন, প্রকৃত ঘটনা হল, মুসলমানরা যখন ইরানি ও খ্রিস্টানদের বিপক্ষে বিজয়ী হয় এবং সেসব দেশের শাসনব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নেয় আর ইরানের বাদশাহকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে পলায়নে বাধ্য করে, তখন থেকে ইরানি ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা নিজেদের হৃদয়ে মোটের ওপর আরবদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষত হযরত উমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে হিংসাবিদ্বেষের অগ্নি লুকিয়ে রেখেছিল। তখন জনগণ পারস্পরিক কথাবার্তায় এই হিংসাবিদ্বেষের উল্লেখও করেছিল। এছাড়া তাঁর ওপর আক্রমণকারী আবু লুলু একজন ইরানি, এটি জানার পর হযরত উমর (রা.)-এর সেই কথাও তাদের মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে বারণ করতাম যে, আমাদের কাছে কোন বিধর্মীকে টেনে-হিঁচড়ে আনবে না, কিন্তু তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত কর নি। মদিনায় অনারব বিধর্মীদের সংখ্যা স্বল্পই ছিল কিন্তু একটি দল ছিল তারা, যাদের হৃদয় ক্রোধ এবং প্রতিশোধের নেশায় পরিপূর্ণ ছিল, যাদের হৃদয়ে হিংসাবিদ্বেষের আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। কে জানে! হতে পারে এটি তাদেরই ষড়যন্ত্র ছিল।

আর হয়ত আবু লুলু'র উক্ত কৃতকর্ম সেই ষড়যন্ত্রের পরিণাম, যার জাল ঐসব ইসলামের শত্রুরা নিজেদের হিংসাবিদ্বেষ এবং শত্রুতার পিপাসা নিবারণের জন্য বুনেছিল। আর তারা ভেবেছিল, এভাবে আরবদের একতা টুকরো টুকরো করে মুসলমানদের ক্ষমতা খর্ব করা যাবে। ঘটনার আসল রহস্য জানার জন্য হযরত উমর (রা.)-এর পুত্ররা সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত ছিলেন। রহস্য উন্মোচন করে ঘটনার গভীরে তারা প্রবেশ করতে পারতেন যদি আবু লুলু ফিরোয আত্মহত্যা না করত কিন্তু সে আত্মহত্যা করে সেই রহস্য নিজের সাথে কবরে নিয়ে যায়। প্রশ্ন হল এটিই কি বিষয়ের অবসান? এ রহস্য উদঘাটনের কি কোন উপায় নেই? এই লেখক যিনি এর রহস্য উদঘাটনের পক্ষে তিনি লিখেন, না বরং ঐশী তকদীর চেয়েছে যে, আরবের এক সর্দার সেই রহস্য সম্বন্ধে যেন অবগত হন এবং সেই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) যখন সেই ছুরিটি দেখেন যেটি দিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল, তিনি বলেন, আমি গতকাল এই ছুরি হুরমুযান এবং জুফাইনার হাতে দেখেছিলাম। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম- এই ছুরি দিয়ে কী করবে? তারা বলে, মাংস কাটব কেননা, আমরা মাংসে হাত লাগাই না আর হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর বলেন, আমি হযরত উমর (রা.)-এর ঘাতক আবু লুলু'র পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জুফাইনা এবং হুরমুযান উভয়েই তার সাথে ছিল; তারা পরস্পর কানাঘুষা করছিল। হঠাৎ করে আমি তাদের কাছে গেলে তারা দৌড়ে পালায় আর অমনি ঘটনাচক্রে তাদের কাছে থাকা একটি দু'ধারী খঞ্জর পড়ে যার

হাতলটি ছিল এর মধ্যবর্তী স্থানে। তিনি বলেন, ভাল করে দেখ তো! হযরত উমর (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত খঞ্জরটি দেখতে কেমন? মানুষজন দেখল, হুবহু সেই খঞ্জরটি-ই; যেমনটি হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর বর্ণনা করেছেন। লেখক বলছেন, এ বিষয়ে তাই আর সংশয়-সন্দেহের মোটেও অবকাশ থাকে না। তাদের দু'জনের উভয়েই সত্য সাক্ষ্যদাতা বরং মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আর সাক্ষ্য দিচ্ছেন, যে ছুরিটি দিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয় সেটি হুরমুযান এবং জুফাইনার কাছে ছিল। তাঁদের এক সাক্ষীর মতে, তিনি (রা.) হত্যাকারী আবু লুলু'কে হত্যাকাণ্ডের পূর্বে সেই দু'জনের সাথে চক্রান্ত করতে দেখেছেন আর উভয়ের মতে, এসব-ই ছিল সেই রাতের ঘটনা যার পরদিন ভোরবেলা হযরত উমর (রা.)-এর ওপর আক্রমণ করা হয়। এতকিছুর পরেও কেউ কি এ বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে যে, আমীরুল মু'মিনীন যে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন তার মূল নায়ক ছিল এই তিনজন। তবে এটিও হতে পারে যে, অন্য কোন ইরানি অথবা অন্যান্য জাতির ব্যক্তিবর্গ এতে জড়িত থাকতে পারে যাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়েছিল।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকরের সাক্ষ্য শোনামাত্রই হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমরের দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবী রক্তে রঞ্জিত বলে মনে হল। তাঁর হৃদয়ে একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, মদিনা নগরীতে বসবাসরত সমস্ত অভিবাসীরা এই নেক্কারজনক ষড়যন্ত্রে শামিল এবং তাদের সবার হাত এ হত্যাকাণ্ডের রক্তে রঞ্জিত। তিনি তৎক্ষণাৎ তরবারী ধারণ করেন এবং সর্বপ্রথমে হুরমুযান এবং জুফাইনা'কে শেষ করে দেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে, তিনি প্রথমে হুরমুযানকে ডাকেন। সে যখন বেরিয়ে আসে তখন তিনি (রা.) বলেন, "আমার সাথে একটু আসো তো! আমার ঘোড়াটি দেখ"– এই বলে তিনি খানিকটা পিছনে সরে দাঁড়ান। সে যখন তার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি তরবারী দিয়ে তাকে সজোরে আঘাত করেন। ইরানি সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ হুরমুযান) যখন তরবারীর প্রখরতা অনুভব করে তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে। রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর বলেন, অতঃপর আমি জুফাইনা'কে ডাকি। সে ছিল হিরা নগরীর একজন খ্রিস্টান এবং হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর দুধভাই। এই আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণেই হযরত সা'দ (রা.) তাকে মদিনাতে নিয়ে এসেছিলেন যেখানে সে লোকদের পড়ালেখা শিখাত। যখন আমি তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করি তখন সে তার দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে ক্রুশের চিহ্ন আঁকে। হযরত আব্দুল্লাহ্'র অন্য ভাইও নিজ পিতৃহত্যার জেরে তার চেয়ে কোন অংশে কম উত্তেজিত ছিলেন না এবং সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)।

যাহোক, তিনি (রা.) যা করেছেন এর কোন আইনি সনদ ছিল না। কোন ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, নিজেই প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হবে।

অথবা নিজের প্রাপ্য বুঝে নিবে। যেখানে বিষয়ের সিদ্ধান্ত মহানবী (সা.)-এর যুগে তিনি স্বয়ং এবং তাঁর তিরোধানের পর তাঁর খলীফাগণের জন্য নির্ধারিত ছিল। তারা মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত দিতেন আর অপরাধীর বিরুদ্ধে কিসাসের সিদ্ধান্ত জারি করতেন। কাজেই হযরত উবায়দুল্লাহ্'র কর্তব্য ছিল– তিনি (রা.) যখন সেই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারেন যার ফলে তাঁর পিতার প্রাণহানি ঘটে; আমীরুল মু'মিনীনের কাছে এর সুষ্ঠু বিচার দাবি করা। তাঁর দৃষ্টিতে এটি যদি ষড়যন্ত্র বলে প্রতীয়মান হত তাহলে তিনি কিসাসের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতেন বা প্রমাণিত না হলে অথবা এ বিষয়ে আমীরুল মু'মিনীনের হৃদয়ে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলে অর্থাৎ নতুন খলীফার হৃদয়ে সৃষ্ট সন্দেহের কারণে সে অনুপাতে দণ্ড হ্রাস করতেন কিংবা এই রায় দিতেন যে, কেবল আবু লুলু'ই অপরাধী। [আল ফারুক উমর (রা.), প্রণেতা– মুহাম্মদ হ্যায়কেল, অনুবাদক– হাবীব আশ আর, পৃষ্ঠা: ৮৬৯-৮৭২, ইসলামী কুতুব খানা, উর্দু বাজার, লাহোর।] মোটকথা, তিনি যা-ই করেছেন, আইনের দৃষ্টিতে এর কোন অধিকার ছিল না। সারকথা হল,

যদিও এটি একেবারে অমূলক নয় যে, এ হত্যাকাণ্ডটি রীতিমত ষড়যন্ত্র ছিল।

কিন্তু সে সময়কার পরিস্থিতির দাবি অনুসারে হযরত উসমান (রা.) তৎক্ষণাৎ তদন্ত করাতে সক্ষম হন নি অথবা পরিস্থিতি যা-ই থাকুক না কেন, প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকরা এই সম্পর্কে নীরব ছিলেন। এই যুগের কিছু ঐতিহাসিক লক্ষণাবলীর নিরিখে এ নিয়ে তর্ক করছে আর তাদের যুক্তিতে কিছুটা ওজন আছে বলেও মনে হয়। কেননা এই ষড়যন্ত্রকারীরা এখানেই থেমে থাকে নি। বরং পুনরায় হযরত উসমান (রা.)ও একই ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। আর এ কারণে এই সন্দেহ আরও দৃঢ়তা পায় যে, ইসলামের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও বিজয়কে প্রতিহত করার জন্য এবং নিজেদের প্রতিশোধের আগুন নিভানোর জন্য বহিঃশক্তির একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অধীনে হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছিল। বাকি আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমার পিতার ওপর যখন আক্রমণ হয় তখন আমি তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলাম। লোকেরা তাঁর প্রশংসা করেছিল এবং বলেছিল জাযাকাল্লাহু খাইরান। অর্থাৎ, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্কে ভালবাসি এবং আমি ভয়ও করি। লোকেরা বলল, আপনি খলীফা নিযুক্ত করে দিন।

তিনি (রা.) বলেন, আমি কি আমার জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও তোমাদের

বোঝা বহন করব। আমার ভাগ সমান সমান হোক, এটিই আমি চাই। অর্থাৎ আমাকে যেন পাকড়াও করা না হয় আর আমি পুরস্কারও চাই না। আমি যদি কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যাই তাহলে তিনিও স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে ছিলেন যিনি আমার থেকে উত্তম ছিলেন অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)। যদি স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করি তাহলে কোন ক্ষতি নেই। আমি যদি তোমাদেরকে কোন স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করা ছাড়াই রেখে যাই তাহলে যিনি আমার থেকে উত্তম ছিলেন তিনিও তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করা ছাড়াই রেখে গিয়েছিলেন অর্থাৎ দ্বিতীয় উদাহরণ দিয়েছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর। তিনি (সা.) কোন স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন নি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) বলেন, যখন তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর নাম উল্লেখ করেন তখন আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে, তিনি (রা.) স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করবেন না। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্, বাব ইস্তেখলাফ ও তারকুহু, হাদীস নম্বর : ৪৭১৩)

সহীহ্ মুসলিমের অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে যাই। তিনি বলেন, তুমি কি জান, তোমার পিতা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করবেন না? তিনি (অর্থাৎ, ইবনে উমর) বলেন, আমি বললাম তিনি এমনটি করবেন না। তিনি অর্থাৎ হযরত হাফসা (রা.) বলেন, তিনি এমনটিই করবেন। তিনি (অর্থাৎ, ইবনে উমর) বলেন, আমি কসম খেয়ে বললাম, আমি হযরত উমর (রা.)-এর সাথে পুনরায় কথা বলব। তিনি (অর্থাৎ, ইবনে উমর) বলেন যে, আমি সকাল পর্যন্ত নিরব থাকি আর তাঁর সাথে কোন কথা বলি নি। আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি আমার শপথের কারণে পাহাড়সম বোঝা অনুভব করছিলাম। এরপর আমি ফিরে আসি এবং তাঁর (রা.) কাছে যাই। তিনি (রা.) আমার কাছে মানুষের কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। এরপর আমি তাঁকে হাফসা (রা.) যা বলেছিলেন তা বলি। এরপর আমি বলি, আমি লোকেদের একটি কথা বলতে শুনেছি আর আমি শপথ করে বলেছি যে, আমি আপনার কাছে সে কথা অবশ্যই বলব। মানুষের ধারণা হল, আপনি স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করবেন না। বিষয় হল, যদি কেউ আপনার উট বা বকরি দেখাশোনাকারী হয় আর সে সেগুলো ছেড়ে আপনার কাছে চলে আসে তাহলে আপনি দেখবেন যে, সে সেগুলো নষ্ট করেছে। অতএব, মানুষের তত্ত্বাবধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি (অর্থাৎ, ইবনে উমর) বলেন, হযরত উমর (রা.) আমার সাথে একমত হন এবং কিছুক্ষণের জন্য মাথা নত করেন। এরপর তিনি মাথা তুলেন আর আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেন, মহান আল্লাহ্ নিজেই তাঁর ধর্মের সুরক্ষা করবেন। যদি আমি কাউকে খলীফা মনোনীত না করি তাতে কী হবে? মহানবী (সা.)-ও তো কাউকে খলীফা মনোনীত করেন নি। আর যদি আমি খলীফা মনোনীত করি সেক্ষেত্রে স্মরণ রাখবে হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা মনোনীত করেছিলেন। ইবনে উমর তথা হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি (রা.) যখন হযরত মহানবী (সা.)-এর নাম এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেন তখন আমি বুঝে গিয়েছিলাম, তিনি (রা.) কাউকে মহানবী (সা.)-এর সমকক্ষ করবেন না এবং তিনি কাউকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করবেন না। *(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্, বাব ইস্তেখলাফ ও তারকুহু, হাদীস নম্বর : ৪৭১৪)*

হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.)-কে যখন আহত করা হয় তিনি বেদনায় বিমূঢ় ছিলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিমায় বলেন, আমীরুল মু'মিনীন! যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে আপনি তো মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে ছিলেন এবং অতি উত্তমরূপে আপনি তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন। আর আপনি এমন অবস্থায় তাঁর থেকে পৃথক হয়েছেন যখন তিনি (সা.) আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর আপনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথেও ছিলেন আর অতি উত্তমরূপে তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন। এরপর তাঁর থেকেও আপনি এমন অবস্থায় পৃথক হয়েছেন যখন তিনি (রা.) আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এরপর আপনি তাঁদের সাহাবীদের সাথে ছিলেন আর আপনি অতি চমৎকারভাবে তাদের সঙ্গ দিয়েছেন, আজ আপনি যদি তাদের ছেড়ে যান তাহলে আপনি এমন অবস্থায় তাদের ছেড়ে যাবেন যখন তারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। হযরত উমর (রা.) বলেন, এই যে তুমি মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য এবং তাঁর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করলে এটা আমার প্রতি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তুমি যে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাহচর্য ও তাঁর সন্তুষ্টির কথা বললে এটিও আমার প্রতি মহান আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ। আর তুমি যে আমার দুঃচিন্তা বা উদ্বেগ দেখছ এই উৎকণ্ঠা মূলত তোমার ও তোমার সঙ্গীদের জন্য। আমি আমার ব্যাপারে চিন্তিত নই বরং আমি তো তোমার ও তোমার সঙ্গীদের চিন্তা করছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে যদি পৃথিবীসম সোনাও থাকত তবে আমি অবশ্যই তা ফিদিয়াস্বরূপ দিয়ে হলেও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র শাস্তি দেখার পূর্বেই তা থেকে মুক্তি নিয়ে নিতাম। *[সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলু আসহাবিন নাবীয়ি (সা.), বাব : মানাকেবে উমর বিন খাত্তাব ..., হাদীস নম্বর: ৩৬৯২]*

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বলেন,

"খলীফারা এমন কোন বিপদের সম্মুখীন হন নি যেটিকে তারা ভয় পেয়েছেন। আর যদি এমন কোন বিপদ এসে থাকে তাহলে আল্লাহ্ সেটিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দিয়েছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত উমর (রা.) শহীদ হয়ে গেছেন কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ দেখলে বুঝা যায়,

এই শাহাদতের বিষয়ে হযরত উমর (রা.)-এর কোন ভয়ই ছিল না। বরং তিনি সবসময় দোয়া করতেন যে, 'হে আল্লাহ্!

আমাকে শাহাদতের সৌভাগ্য দাও আর আমাকে মদিনাতেই শহীদ কর’। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁর সারা জীবন এই দোয়া করে কাটান যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে মদিনায় শাহাদতের সৌভাগ্য দিও, তিনি যদি শহীদও হয়ে যান তাহলে আমরা একথা কীভাবে বলতে পারি যে, তিনি এক ভীতিপ্রদ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন অথচ আল্লাহ্ এটিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করেন নি। এতে সন্দেহ নেই, যদি হযরত উমর (রা.) শাহাদাতবরণকে ভয় পেতেন আর তিনি শহীদ হয়ে যেতেন তাহলে বলা যেতে পারত যে, তাঁর ভয়কে আল্লাহ্ শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দেন নি। কিন্তু তিনি তো অনবরত দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্ আমাকে মদিনায় শাহাদাত দান কর। অতএব, তার শাহাদাতবরণ থেকে একথা কীভাবে সাব্যস্ত হতে পারে যে, তিনি শাহাদাতবরণকে ভয় পেতেন! যেক্ষেত্রে তিনি শাহাদাতবরণকে ভয়ই পেতেন না বরং শাহাদাত লাভের জন্য দোয়া করতেন যা আল্লাহ্ তা’লা গ্রহণ করেছেন সেক্ষেত্রে বুঝা গেল, এই আয়াত সংশ্লিষ্ট এমন কোন ভয়ের তিনি সম্মুখীন হন নি যেটিকে তাঁর হৃদয় অনুভব করেছেন আর এই আয়াতে যেমনটি আমি ইতোমধ্যে বলেছি, এটিই উল্লিখিত হয়েছে যে; খলীফারা যে বিষয়কে ভয় পাবেন তা কখনও সংঘটিত হতে পারে না আর আল্লাহ্ তা’লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাদের ভয়কে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। কিন্তু কোন বিষয়কে খলীফা যখন ভয়ই পান না বরং সেটিকে নিজের সম্মান ও উন্নত পদমর্যাদার কারণ মনে করছেন সেক্ষেত্রে সেটিকে ভয় আখ্যা দিয়ে একথা বলা যে, এই ভয়কে কেন শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দেয়া হল না- অবান্তর কথা।” এ বিষয়টিও বুঝার বিষয়।

তিনি (রা.) বলেন, “আমি যখন হযরত উমর (রা.)-এর উক্ত দোয়া পড়েছি তখন আমি মনে মনে বলেছি, বাহ্যত এ দোয়ার অর্থ ছিল, শত্রু মদিনায় আক্রমণ করবে এবং তার আক্রমণ এত ভয়াবহ হবে যে, সব মুসলমান মারা যাবে এরপর তারা যুগ-খলীফার কাছে এসে তাঁকেও শহীদ করবে কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা হযরত উমর (রা.)-এর দোয়াকেও কবুল করেছেন আর এমন উপকরণ বা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যার ফলে ইসলামের সম্মান বজায় থেকেছে। বাস্তবে মদিনায় বহিরাগত কোন শত্রুর আক্রমণ না হয়ে মদিনার ভেতর থেকেই এক নোংরা ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয় এবং সে ছুরিকাঘাতে তাকে শহীদ করে দেয়।” *(তফসীরে কবীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭৮)*

হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনা এবং এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ক্রীতদাস মুক্তি সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করত বলেন, “সর্বপ্রথম এই নির্দেশ দিয়েছে যে, তোমরা অনুগ্রহ করে কোন মুক্তিপণ ছাড়াই তাদেরকে তথা ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দাও। এরপর এটি বলেছে যে, এমনটি যদি না করতে পার তবে মুক্তিপণ পরিশোধ করে স্বাধীন করে দাও। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন রয়ে যায়, অর্থাৎ কোন দাস যদি নিজে মুক্তিপণ পরিশোধ করার সামর্থ্য না রাখে আর তার রাষ্ট্র, অর্থাৎ যে দেশের সাথে তার সম্পর্ক সেই রাষ্ট্রের যদি তাকে স্বাধীন করার বিষয়ে কোন আগ্রহ না থাকে; আবার তার আত্মীয়স্বজনেরাও যদি ভ্রুক্ষেপহীন হয় তবে সে তোমাদের অনুমতিসাপেক্ষে কিস্তি আকারে মুক্তিপণ নির্ধারণ করাতে পারে। বন্দি নিজেও তার মুক্তিপণের কিস্তি নির্ধারণ করাতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে যতটুকু সে উপার্জন করবে, কিস্তির অংশ বাদ দিয়ে বাকিটা তারই প্রাপ্য হবে, অর্থাৎ বাস্তবে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে। অর্থাৎ সে যা আয় করবে তা থেকে সে মুক্ত হবার জন্য নির্ধারণকৃত কিস্তি প্রদান করবে এবং অবশিষ্ট অর্থ তারই থাকবে আর এটি এক ধরনের স্বাধীনতা বৈ কি। হযরত উমর (রা.)-কে এমনই এক দাস হত্যা করেছিল যে মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি।

সেই দাস যে মুসলমান ব্যক্তির নিকট থাকত তাকে সে একদিন বলে, আমার এতটুকু সামর্থ্য আছে। আপনি আমার ওপর মুক্তিপণ নির্ধারণ করুন যা আমি মাসিক কিস্তি আকারে ধীরে ধীরে সবটুকু পরিশোধ করব। তিনি অত্যন্ত সামান্য অঙ্কের একটি কিস্তি নির্ধারণ করেন এবং সে তা পরিশোধ করতে থাকে। একবার হযরত উমর (রা.)-এর কাছে সে অভিযোগ করে, আমার মালিক আমার ওপর মোটা অঙ্কের কিস্তি নির্ধারণ করে রেখেছে, তাই আপনি সেটি কমিয়ে দিন। হযরত উমর (রা.) তার আয়-উপার্জনের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখেন, যতটুকু উপার্জন হওয়ার কথা ভেবে কিস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সে আয় করে থাকে। হযরত উমর (রা.) এটি দেখে বলেন, এই পরিমাণ আয়ের বিপরীতে তোমার কিস্তি তো খুবই নগণ্য, তাই এরচেয়ে কমানো সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তের কারণে সে ভীষণ রাগান্বিত হয় এবং সে ভাবে, আমি যেহেতু ইরানি তাই আমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে আর আমার মালিক যেহেতু আরব তাই তাকে সমীহ করা হয়েছে। কাজেই, এই রাগের বশে পরের দিন সে তাঁর (রা.) ওপর খঞ্জরের আক্রমণ করে এবং তিনি (রা.) সেই আঘাতের ফলে শহীদ হয়ে যান।” *(ইসলাম কা ইকতেসাদী নিযাম, আনোয়ারুল উলূম, অষ্টাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮-২৯)*

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আরও বলেন,

“পৃথিবীতে কেবল দুটি জিনিস সততা থেকে দূরে ঠেলে দেয়, হয় চরম বিদ্বেষ নয়ত সীমাহীন ভালবাসা।

অনেক সময় একটি তুচ্ছ ঘটনা থেকেও চরম বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.)-এর সময়ে দেখ! কত সামান্য ঘটনা থেকে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছে যা ইসলামী বিশ্বকে কত বড় ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। আমি মনে করি, এ ঘটনার জের এখনও চলমান রয়েছে। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে তাঁর কাছে একটি মামলা উপস্থাপিত হয়। (বিষয় হল,) কোন ব্যক্তির ক্রীতদাস আয় করত অনেক কিন্তু তার মালিককে কম দিত। হযরত উমর (রা.) এই ক্রীতদাসকে ডেকে বলেন, মালিককে বেশি প্রদান কর।

সে সময় পেশাজীবী মানুষ কম ছিল তাই কামার এবং কাঠমিস্ত্রির খুব কদর ছিল। সেই ক্রীতদাস আটা পেষার চাক্কী বানাত এবং এর ফলে সে ভাল আয়-রোজগার করত। হযরত উমর (রা.) তার জন্য সাড়ে তিন আনা নির্ধারণ করে বলেন, মালিককে এই পরিমাণ দিবে। এটি খুবই সামান্য অঙ্ক কিন্তু তার ধারণা ছিল, হযরত উমর (রা.) ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এর ফলে তার হৃদয়ে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একবার হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, আমাকেও একটি চাক্কী বানিয়ে দাও। উত্তরে সে বলে, এমন চাক্কী বানিয়ে দিব যা খুব ভাল চলবে। এটি শুনে কেউ একজন হযরত উমর (রা.)-কে বলে, আপনাকে হুমকি দিচ্ছে। পূর্বে বর্ণিত ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিংবা একই ঘটনা এটি। মোটকথা, তারই ঘটনা এটি অর্থাৎ সেই ক্রীতদাসের। তিনি (রা.) বলেন, তার শব্দ থেকে এমনটি প্রকাশ পায় না। প্রথম রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত উমর (রা.) নিজেই বলেছিলেন, সে হুমকি দিচ্ছে। সে বলে, তার কণ্ঠে হুমকির সুর ছিল। অবশেষে একদিন উমর (রা.) নামায পড়ছিলেন, এমন সময় সেই দাস তাঁকে খঞ্জর দিয়ে হত্যা করে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেন, সেই উমর (রা.) যিনি কোটি কোটি মানুষের বাদশাহ্ ছিলেন, যিনি বিশাল রাজত্বের শাসক ছিলেন, মুসলমানদের সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাঁকে মাত্র সাড়ে তিন আনার জন্য হত্যা করা হয়। কিন্তু বিষয় হল, যাদের প্রকৃতিতে হিংসা ও বিদ্বেষ থাকে সে সাড়ে তিন আনা কিংবা দুই আনা দেখে না বরং তারা তাদের মনের জ্বালা মিটাতে চায়। তাদের প্রকৃতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় তারা দেখে না, আমাদের বা অন্যের জন্য এটি কী পরিণতি বয়ে আনবে। হযরত উমর (রা.)-এর হন্তারককে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, সে এই পাশবিক কাজটি কেন করেছিল? তখন সে উত্তরে বলেছিল, আমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিল, তাই আমি তার প্রতিশোধ নিয়েছি।"

এটি পূর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হয় নি। হতে পারে, তাকে ধরার সময় সে যে সময়টুকু পেয়েছে তখন বলেছিল, আমি এ কারণে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছি আর এরপর সে আত্মহত্যাও করে বসে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি এই হৃদয় বিদারক ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছি, ইসলাম এখনও এর জের কাটিয়ে উঠতে পারে নি। আর সেটি এভাবে যে, যদিও মৃত্যু সবসময় মানুষের সাথে লেগেই আছে, তথাপি এমন সময় মৃত্যুর কথা ভাবাও হয় না যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুদৃঢ় থাকে, কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন দুর্বল হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্য অবনতির দিকে ধাবিত হয় তখন মানুষ নিজে থেকেই ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করতে আরম্ভ করে। তারা একে অপরের সাথে এ বিষয়ে কথা বলে না কিন্তু আপনাআপনি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায় যা ভবিষ্যত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য ইমামের মৃত্যুর সময় মানুষ সচেতন থাকে। বয়স ৬৩ বছর হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু হযরত উমর (রা.)-এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মজবুত ছিল তথাপি সাহাবীদের মাথায় এটি ছিল না যে, হযরত উমর (রা.) এত তাড়াতাড়ি তাদের ছেড়ে চলে যাবেন। এজন্য তারা ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি বেখবর ছিলেন। অর্থাৎ অকস্মাৎ হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর বিপদ আপতিত হয়। সেই সময় জামা'ত অন্য কোন ইমামকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তখন প্রস্তুতি না থাকার ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হল, হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে মানুষের তেমন গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় নি যেমনটি হওয়া উচিত ছিল। এ কারণে ইসলামের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায় এবং হযরত আলী (রা.)-এর যুগে আরও বেশি দুর্বল হয়ে যায়। *(খুতবাতে মাহমুদ, একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪০-২৪১)*

পরবর্তীতে যেসব নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল সেগুলোর কারণ তাঁর দৃষ্টিতে এটিও হতে পারে।

নৈরাজ্যের যুগে নামাযের স্থানে কিছু লোক নিরাপত্তার জন্য দাঁড়ানো আবশ্যক।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এটিও বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, "পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হল, নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে অর্ধেক লোক দণ্ডায়মান থাকবে। যদিও এটি যুদ্ধের সময়কার কথা যখন নিরাপত্তার জন্য একটি দলের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু এ থেকে এই ব্যাখ্যাও করা যায় যে, ছোটোখাটো বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করতে যদি কিছু সংখ্যক লোককে নামাযের সময় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় তাহলে এটি আপত্তির কোন বিষয় নয় বরং এটি করা অত্যাবশ্যক। তিনি (রা.) বলেন, যুদ্ধের সময় যদি এক হাজারের মধ্যে পাঁচশ' জনকে নিরাপত্তার জন্য দাঁড় করানো যেতে পারে তাহলে কী ছোটোখাটো শঙ্কার সময় এক হাজারের মধ্যে থেকে ৫-১০জন লোককেও নিরাপত্তার জন্য দাঁড় করানো যাবে না? বিপদ নিশ্চিত নয়– এটি বলা বৃথা কাজ। হযরত উমর (রা.)-এর সাথে কী হয়েছে? তিনি (রা.) নামায পড়ছিলেন এবং মুসলমানরাও নামায পড়ায় মগ্ন ছিল, এমন সময় এক দুর্বৃত্ত মনে করে, আক্রমণের জন্য এটিই উপযুক্ত সময়। তাই সে সামনে অগ্রসর হয় আর খঞ্জর দিয়ে আক্রমণ করে বসে। এই ঘটনার পরও যদি কেউ বলে, নামাযের সময় পাহারা দেয়া নামাযের নিয়মনীতি বা মর্যাদা পরিপন্থী কাজ তাহলে সে তার মূর্খতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো ছাড়া আর কিছুই করে না। এর দৃষ্টান্ত সেই মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আর একটি তির এসে তার গায়ে বিদ্ধ হওয়ায় রক্ত বের হতে থাকে। তখন সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে এবং রক্ত মুছতে মুছতে একথা বলছিল, হে আল্লাহ্! এটি যেন একটি স্বপ্নই হয়। এটি যেন সত্য ঘটনা না হয় যে, আমি তিরবিদ্ধ হয়েছি। ইতিহাস হতে এটিও প্রমাণিত যে, একবার সাহাবীরা নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন নি, যার ফলে তাঁদেরকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন হযরত আমর বিন আস (রা.) যখন মিশর বিজয়ের উদ্দেশ্যে যান এবং সে অঞ্চল জয়

করেন তখন তিনি নামায পড়ানোর সময় পাহারার ব্যবস্থা করতেন না। শত্রুপক্ষ যখন লক্ষ্য করে, মুসলমানরা এ অবস্থায় সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক থাকে তখন তারা একটি দিন নির্ধারণ করে কয়েক'শ সশস্ত্র ব্যক্তিকে ঠিক সেই সময় প্রেরণ করে যখন মুসলমানরা সিজদারত ছিল আর পৌঁছামাত্রই তারা তরবারি দিয়ে মুসলমানদের শিরচ্ছেদ করতে শুরু করে। ইতিহাস সাক্ষী, শত শত সাহাবী সেদিন হয় নিহত হয় নতুবা আহত হয়। এক জনের পর আরেকজন এবং দ্বিতীয়জনের পর তৃতীয়জন মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল কিন্তু সাথের জন বুঝতেই পারছিল না যে, এসব কী হচ্ছে! ততক্ষণে সেনাবাহিনীর মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) বিষয়টি অবগত হওয়ার পর তাকে অনেক ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন, আপনি কি জানতেন না যে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু তিনি, অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) কি জানতেন যে, মদিনাতে তাঁর সাথেও এমনটিই ঘটবে! এই ঘটনার পর থেকে সাহাবীরা (নিরাপত্তার) ব্যবস্থা করেন, অর্থাৎ যখনই নামায পড়তেন সর্বদা নিরাপত্তার খাতিরে পাহারাদার নিযুক্ত করতেন।" *(খুতবাতে মাহমুদ, ষষ্ঠদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৮-৬৯)*

হযরত উমর (রা.)-এর ঋণ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং তাঁর পুত্রকে এ সম্পর্কে বলেছিলেন। এ সম্পর্কে আরও কথা হল, তিনি তাঁর পুত্রকে বলেন, হে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর! দেখ তো আমার ঋণের পরিমাণ কত? তিনি হিসাব করে দেখেন, (ঋণের পরিমাণ হল) ৮৬ হাজার দিরহাম। তিনি (রা.) বলেন, হে আব্দুল্লাহ্! যদি উমরের বংশধরদের সম্পদ এর জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত হয় তবে তাদের সম্পদ হতে আমার এই ঋণ পরিশোধ করে দিবে, কিন্তু তাদের সম্পদ যদি যথেষ্ট না হয় তবে বনু আদী বিন কা'ব গোত্রের কাছ থেকে চেয়ে নিবে আর যদি তাও যথেষ্ট না হয় তবে কুরাইশদের কাছে চাইবে। এছাড়া অন্য কারও কাছে যাবে না। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত ১৯৯০)*

সাহাবীগণ জানতেন, অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত আমাদের এই ইমাম এত বড় অঙ্ক নিজের জন্য ব্যয় করেন নি, (বরং) তাঁরা জানতেন, এই অর্থও তিনি অভাবী ও দরিদ্রদের পেছনেই ব্যয় করেছিলেন, যে কারণে এ পরিমাণ ঋণ হয়ে গেছে। এজন্য হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আপনি বায়তুল মাল থেকে ঋণ নিয়ে আপনার এই ঋণ পরিশোধ করে দেন না কেন? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসছি! তুমি কি চাও, তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমার (মৃত্যুর) পর একথা বলে বেড়াও যে, আমরা তো আমাদের অংশ উমরের জন্য উৎসর্গ করেছি। এখন তো তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিবে, কিন্তু আমার (মৃত্যুর) পর এমন বিপদ আপতিত হতে পারে যেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমার মুক্তি লাভের কোন উপায় থাকবে না। অতঃপর হযরত উমর (রা.) তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-কে বলেন, আমার ঋণ পরিশোধের দায়িত্বভার গ্রহণ কর। অতএব, তিনি এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা.) সমাহিত হবার পূর্বেই তার ছেলে শূরার সদস্যবৃন্দ ও কতক খ্রিস্টানকে তাঁর এই জামানতের বিষয়ে সাক্ষী রাখেন, অর্থাৎ ঋণ (পরিশোধের) যে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন (তার ওপর)। হযরত উমর (রা.) সমাহিত হওয়ার পর এক জুমু'আ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) ঋণের অর্থ নিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং কয়েকজন সাক্ষীকে সামনে রেখে এই বোঝা থেকে তিনি অব্যাহতি লাভ করেন। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত ১৯৯০)*

ঋণ পরিশোধ–সংক্রান্ত আরেকটি রেওয়ায়েত 'ওয়াফাউল ওয়াফা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। হযরত ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, যখন হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে আসে তখন তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন। তিনি (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত হাফসা (রা.)-কে ডেকে এনে বলেন, আমার ওপর কিছু ঋণ রয়েছে যা আল্লাহ্‌র সম্পদ হতে নেয়া। আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চাই যখন আমার ওপর কোন ঋণ থাকবে না। অতএব, এ ঋণ পরিশোধের জন্য তোমরা এই বাড়িটি বিক্রি করে দিবে, অর্থাৎ যেখানে তিনি থাকতেন সেটি। এরপর যদি কিছু ঘাটতি থেকে যায় তাহলে বনু আদী গোত্রের কাছে চাইবে আর এরপরও যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে কুরাইশের কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে চাইবে না। হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে যান আর তিনি অর্থাৎ মুয়াবিয়া (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর বাড়িটি কিনে নেন। এটিকে 'দারুল কাযা' বলা হয়। তিনি (রা.) সেই বাড়িটি বিক্রি করে দেন এবং হযরত উমর (রা.)-এর ঋণ পরিশোধ করেন। এজন্য এই বাড়িটি 'দারুল কাযায়ে দায়নে উমর' নামে অভিহিত হতে থাকে, অর্থাৎ সেই বাড়ি যা বিক্রির মাধ্যমে হযরত উমর (রা.)-এর ঋণ পরিশোধ করা হয়েছিল। *(ওফাউল ওফা বেআখবারে দারিল মোস্তফা, প্রণেতা : আল্লামা নূরুদ্দীন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয়াংশ, পৃষ্ঠা: ২২২, মাকতুবাতুল হাক্কানিয়া, মহল্লাহ্ জাঙ্গী পেশওয়ার, পাকিস্তান।)*

স্মৃতিচারণ এখনও চলছে আর আগামীতে অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। *(আল ফযল ইন্টান্যাশনাল, ০৫ নভেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা: ৫-১০)*

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

২২ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

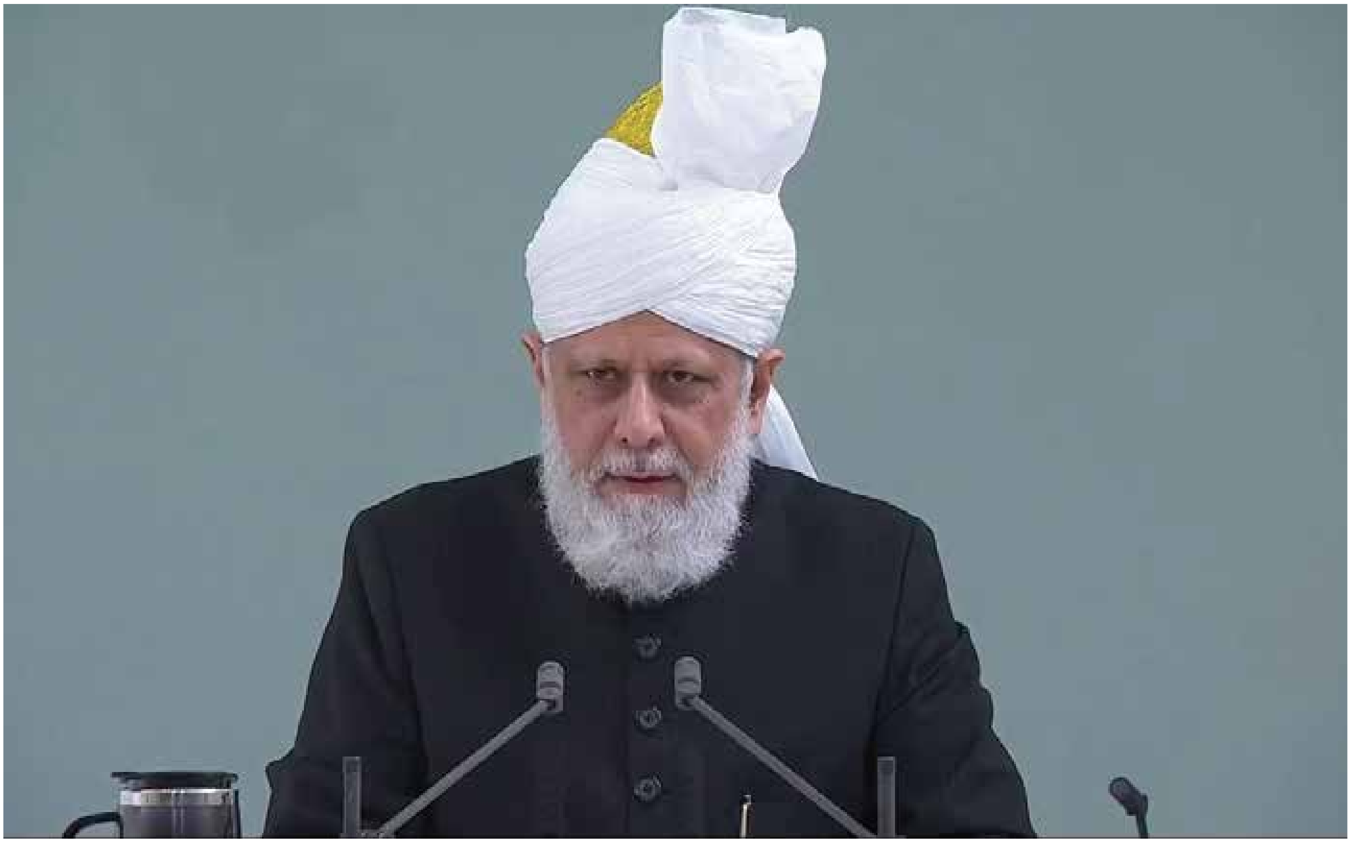

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় আমি হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের প্রেক্ষাপটে হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মধ্যকার পারস্পরিক বিতণ্ডার কথা উল্লেখ করেছিলাম। (সেই সাথে) এটিও বলেছিলাম যে, রেওয়ায়েতটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সে দৃষ্টিকোণ থেকে তা কতটুকু সত্য তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অর্থাৎ তাদের পরস্পরের মাঝে লড়াই হয়েছিল (মর্মে কথাটির সত্যাসত্য জানা নেই)। এ সম্পর্কে আরও অনুসন্ধানের পর যে বিষয়গুলো সামনে এসেছে তা-ও বলে দিচ্ছি। একস্থানে একথারও উল্লেখ পাওয়া গেছে যে, হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) যখন হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হন তখনও হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হন নি। আগেই বলা হয়েছে, উবায়দুল্লাহ্‌র সংকল্প ছিল যে, তিনি (আজ) মদিনার কোন বন্দিকেই আর জীবিত রাখবেন না। প্রাথমিক মুহাজেররা তার বিরুদ্ধে একত্র হয়ে তাকে বাধা দেন এবং তাকে ধমক দেন। কিন্তু তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করব, অর্থাৎ যত কয়েদি ও দাস রয়েছে (তাদেরকে হত্যা করব) আর মুহাজেরদেরও তিনি পাত্তা দেন নি। এমনকি হযরত আমর বিন আস (রা.) তার সাথে অনবরত আলোচনা করতে

থাকেন আর অবশেষে তিনি হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর হাতে তরবারি তুলে দেন। এরপর সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) তাকে বুঝানোর জন্য তার কাছে আসেন, তখন তার সাথেও হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) ঝগড়া করেন। যেভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বাগ্‌বিতণ্ডা হয় আর লোকজনও আপোশ করানোর চেষ্টা করে। আরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যখন এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় তখনও হযরত উসমান (রা.)-এর হাতে বয়আত করা হয় নি। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) তখনও খলীফা মনোনীত হন নি, যেভাবে ইতোপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। *[সীরাতে উমর ফারুক (রা.), মোহাম্মদ রেযা (অনুবাদক) প্রণীত, পৃষ্ঠা: ৩৪২-৩৪৩, ইসলামিয়া লাহোর প্রেস থেকে ২০১০ সালে মুদ্রিত]*

অনুরূপভাবে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-কে এরপর গ্রেফতারও করা হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর হাতে বয়আতের পর, অর্থাৎ খলীফার আসনে সমাসীন হওয়ার পর হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর সামনে পেশ করা হয়। তখন আমীরুল মু'মিনীন মুহাজের ও আনসারদের একটি দলকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা আমাকে এই ব্যক্তি সম্পর্কে মতামত দিন, যে ইসলামের (শিক্ষা বাস্তবায়নের) পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তখন হযরত আলী বিন আবি তালেব (রা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দেয়া ন্যায়পরিপন্থি কাজ হবে, আমার মতে তাকে অর্থাৎ উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-কে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত। কিন্তু কোন কোন মুহাজের এই রায়কে অসহনীয় কঠোরতা ও কড়া শাস্তি আখ্যা দেন এবং বলেন, গতকাল উমর (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে আর আজ তার পুত্রকে হত্যা করা হবে? এই আপত্তি উপস্থিত লোকদের দুঃখভারাক্রান্ত করে আর হযরত আলী (রা.)ও নীরব থাকেন। কিন্তু যাহোক, হযরত উসমান (রা.) চাইলেন যেন উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে কেউ এই স্পর্শকাতর অবস্থা উত্তরণের জন্য কোন পথ খুঁজে বের করেন বা পরামর্শ দেন। সেই বৈঠকে হযরত আমর বিন আস (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ আপনাকে এর ঊর্ধ্বে রেখেছেন। (কেননা) এটি তখনকার ঘটনা যখন আপনি মুসলমানদের আমীর ছিলেন না আর এ ঘটনা যেহেতু আপনার খিলাফতকালে সংঘটিত হয় নি, তাই আপনার ওপর এর কোন দায়ভারও বর্তায় না। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তার এই রায়ে আশ্বস্ত হতে পারেন নি, বরং তিনি (রা.) রক্তপণ দেয়াকেই সঠিক মনে করেন। তাই তিনি (রা.) বলেন, আমি হলাম এসব নিহত লোকের অভিভাবক, তাই রক্তপণ নির্ধারণ করে আমার সম্পদ থেকে আমি তা পরিশোধ করব। এটি হল এ সম্পর্কে একটি রায়।

তাবারীর ইতিহাসের বর্ণনা অনুসারে হযরত উসমান (রা.) হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-কে হুরমুযানের পুত্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যেন সে তার পিতৃহত্যার বিনিময়ে শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করে, কিন্তু তার পুত্র (তাকে) ক্ষমা করে দেয়।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং একটি সমস্যার সমাধান বর্ণনা করতে গিয়ে এর বিস্তারিত লিখেছেন যা আমি বিগত এক খুতবায় বর্ণনা করেছি, এখানে বিষয়টি পরিষ্কার করতে পুনরায় বলছি যে, নিহত চুক্তিবদ্ধ কাফেরের বিনিময়ে মুসলমান হন্তারককে শাস্তি দেয়া যায় কি না?

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, তাবারীতে কুমাযবান বিন হুরমুযান তার পিতার হত্যার ঘটনা বর্ণনা করেন। হুরমুযান একজন ইরানি নেতা ও অগ্নি উপাসক ছিল এবং দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর হত্যার ষড়যন্ত্রে সে সন্দেহভাজন ছিল। এতে কোন ধরনের তদন্ত ছাড়াই উত্তেজনার বশে উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর তাকে হত্যা করে বসেন। সেই পুত্র বলে, ইরানি লোকেরা মদিনায় পরস্পর মিলেমিশে বাস করত, যেভাবে প্রচলিত রীতি হল ভিনদেশে যাওয়ার পর দেশপ্রেম প্রগাঢ় হয়ে যায়। একদিন ফিরোজ, অর্থাৎ যে হযরত উমরের হত্যাকারী ছিল, সে আমার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার কাছে একটি দু'ধারী খঞ্জর ছিল। (হুরমুযানের ছেলে এটি বর্ণনা করেন যে,) আমার পিতা এই খঞ্জরটি নিয়ে নেয় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে, এই দেশে এই খঞ্জর দিয়ে তুমি কী কাজ কর? অর্থাৎ এই দেশ তো শান্তিপূর্ণ দেশ, এখানে অস্ত্রের কী প্রয়োজন রয়েছে? সে বলে, আমি এটি দিয়ে উট হাঁকানোর কাজ করি। যখন তারা দুজন পরস্পর কথা বলছিল তখন কেউ তাদেরকে দেখে ফেলে আর হযরত উমর (রা.)-কে যখন হত্যা করা হয় তখন সে বলে, হুরমুযানকে আমি নিজে এই খঞ্জরটি ফিরোজকে দিতে দেখেছি। তখন হযরত উমরের ছোট ছেলে উবায়দুল্লাহ্ গিয়ে আমার পিতাকে হত্যা করে ফেলেন। যখন হযরত উসমান খলীফা নির্বাচিত হন, তখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং উবায়দুল্লাহ্কে গ্রেফতার করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, হে আমার পুত্র! এ হল তোমার পিতার হত্যাকারী এবং তুমি আমাদের তুলনায় তার ওপর বেশি অধিকার রাখ। সুতরাং যাও এবং তাকে হত্যা কর। আমি তাকে ধরে নিয়ে শহরের বাইরে চলে আসি। পথিমধ্যে যার সাথেই আমার সাক্ষাৎ হত সে আমার সাথে যোগ দিত, কিন্তু কেউই আমার সাথে লড়াই করতে আসে নি। তারা কেবল আমার নিকট এতটুকুই নিবেদন করত যে, আমি যেন তাকে ছেড়ে দিই। অতএব আমি (উপস্থিত) সকল মুসলমানকে সম্বোধন করে বলি, আমার কি তাকে হত্যা করার অধিকার আছে? সকলেই উত্তর দেয়, হ্যাঁ! তোমার অধিকার রয়েছে, তাকে হত্যা কর আর উবায়দুল্লাহ্কে তারা (এই বলে) ভর্ৎসনা করতে থাকে যে, সে এমন মন্দ কাজ করেছে। এরপর আমি জিজ্ঞেস করি, তোমাদের কি আমার হাত থেকে তাকে

ছাড়িয়ে নেয়ার অধিকার আছে? তারা উত্তরে বলে, মোটেও নয় আর পুনরায় উবায়দুল্লাহ্‌কে (এই বলে) তিরস্কার করে যে, সে প্রমাণ ছাড়াই তার পিতাকে হত্যা করেছে। এ অবস্থায় আমি খোদা তা'লা এবং সেসব লোকের খাতিরে তাকে মুক্ত করে দেই আর মুসলমানরা আনন্দের আতিশয্যে আমাকে তাদের কাঁধে তুলে নেয়। খোদার কসম! আমি লোকজনের মাথা ও কাঁধে (আরোহিত অবস্থায়) আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছি আর তারা আমাকে মাটিতে পা পর্যন্ত রাখতে দেয় নি। এই রেওয়ায়েত থেকে সাব্যস্ত হয়, সাহাবীদের কর্মপন্থাও এটিই ছিল যে, তারা অ-মুসলিমের মুসলিম হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতেন আর এটিও সাব্যস্ত হয় যে, কেউ যে অস্ত্র দিয়েই নিহত হোক না কেন তাকে (অর্থাৎ হত্যাকারীকে) হত্যা করা হবে। অনুরূপভাবে এটিও প্রমাণিত হয় যে, হত্যাকারীকে গ্রেফতার করা ও তাকে শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপরই বর্তায়, কেননা এই রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয়, উবায়দুল্লাহ্ বিন উমরকে গ্রেফতারও হযরত উসমান (রা.)-ই করেন এবং তিনিই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য হুরমুযানের পুত্রের হাতে তুলে দেন। হুরমুযানের কোন বংশধর তার বিরুদ্ধে মামলাও করে নি আর গ্রেফতারও করে নি।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এখানে এই সন্দেহের নিরসনও আবশ্যক যে, হন্তারককে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে কি নিহত ব্যক্তির বংশধরদের হাতে তুলে দেয়া উচিত, যেমনটি হযরত উসমান করেছিলেন, নাকি স্বয়ং রাষ্ট্রেরই শাস্তি প্রদান করা উচিত? অতএব স্মরণ রাখা উচিত, এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়, তাই ইসলাম এটিকে যুগের দাবির ওপর ছেড়ে দিয়েছে। জাতি তাদের স্বীয় সমাজব্যবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে পন্থাকে অধিক কল্যাণজনক মনে করে তা অবলম্বন করতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ দুটি পন্থাই বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে লাভজনক হয়ে থাকে। *(তফসীরে কবীর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৯-৩৬১)*

এ ব্যাখ্যার পর এখন আমি হযরত উমর (রা.)-এর আরও কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি। মৃত্যুর সময় হযরত উমর (রা.)-এর কাকুতিমিনতি, বিনয় ও নম্রতার চিত্র সম্পর্কে তার পুত্র বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর পুত্রকে বলেন, আমার কাফনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্‌র নিকট যদি আমার জন্য কল্যাণ থাকে তাহলে তিনি আমাকে এর চেয়ে উত্তম পোশাক দান করবেন। কিন্তু যদি আমি সেটির যোগ্য না হই তবে আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিবেন এবং সেটি খুব দ্রুত করবেন। এছাড়া আমার কবরের ব্যাপারেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্‌র সমীপে যদি আমার জন্য এতে কল্যাণ থাকে তবে এটিকে আমার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেবেন। কিন্তু আমি যদি এর ব্যতিক্রম হই তবে এটিকে আমার জন্য এতটা সংকীর্ণ করে দিবেন যে, আমার পাঁজরের হাড় ভেঙে যাবে। আমার জানাযার সাথে কোন নারীকে নিয়ে যাবে না। আমার এমন কোন প্রশংসা করবে না যা আমার মাঝে নেই, কেননা আল্লাহ্ আমাকে অধিক জানেন। আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত হাঁটবে। আল্লাহ্‌র কাছে যদি আমার জন্য কল্যাণ থাকে তবে তোমরা আমাকে সেই জিনিসের দিকে পাঠাচ্ছ যা আমার জন্য অধিক উত্তম, কিন্তু যদি তেমনটি না হয় তবে তোমরা তোমাদের কাঁধ থেকে এই অনিষ্টকে অপসারণ করবে যা তোমরা বহন করছ। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুতে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)*

এছাড়া এটিও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত উমর (রা.) ওসীয়্যত করেছিলেন, আমাকে কস্তুরী প্রভৃতি দিয়ে গোসল দেবে না। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুতে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)*

হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি হযরত উমরের কাছে যাই যখন তার মাথা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরের উরুতে রাখা ছিল। হযরত উমর (রা.) তাকে, অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরকে বলেন, আমার গাল মাটিতে রেখে দাও। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমার উরু এবং মাটি একই সমতলে রয়েছে, অর্থাৎ এতে আর কতটুকুই-বা ব্যবধান রয়েছে! হযরত উমর (রা.) দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বলেন, তোমার মঙ্গল হোক! আমার মাথা মাটিতে রেখে দাও। এরপর হযরত উমর (রা.) নিজের দুই পা একত্র করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি হযরত উমর (রা.)-কে (একথা) বলতে শুনি যে, আমি এবং আমার মায়ের ধ্বংস, যদি আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা না করেন, এ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৪-২৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুতে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)*

হযরত সিমাক হানাফী বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আমি হযরত উমরকে বললাম, আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে নতুন শহর আবাদ করেছেন, আপনার মাধ্যমে অনেক বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং আপনার মাধ্যমে অমুক অমুক কাজ হয়েছে। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার তো আকাঙ্ক্ষা হল এ থেকে আমি যেন সেভাবে মুক্তি লাভ করি যেন আমার জন্য কোন পুরস্কারও না থাকে আর কোন বোঝাও না থাকে অর্থাৎ এর জন্য গর্বের কিছু নেই যে, আমি বড় বড় কাজ করেছি এবং আমার যুগে বড় বড় বিজয় অর্জিত হয়েছে, বরং আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতির প্রাধান্য ছিল এবং পরকালের চিন্তা ছিল।

যায়েদ বিন আসলাম তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত উমরের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি বলেন, তোমরা আমার প্রতি ইমারত সম্পর্কে সন্দেহ করে থাক, কিন্তু খোদার কসম, আমি তো পছন্দ করি, আমি যেন এমনভাবে মুক্তি লাভ করি যে, لا على ولا لى

(লা আলাইয়া ওয়ালা আলী) অর্থাৎ আমি কোন পুরস্কার চাই না আর আমাকে যেন শাস্তিও দেয়া না হয়। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুতে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)*

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায় মানুষ, যিনি তার সারা জীবনই ইসলাম ধর্মের বেদনা ও চিন্তায় (নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য) ভুলে গেছেন। যিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নত থেকে উন্নততর ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যদিও আমলের দিক থেকে তাঁর ত্যাগ হযরত আবু বকর (রা.)-এর কুরবানীর মানে পৌঁছে নি, কিন্তু ইচ্ছা ও নিয়্যতের দিক থেকে সবার (কুরবানী) এক সমান ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন হযরত উমর (রা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু বইতে থাকে। আর তিনি বলেন, খোদা তা'লা আবু বকর (রা.)-এর প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করুন। আমি বহুবার তাঁর চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনও সফল হই নি। একবার মহানবী (সা.) বলেন, আর্থিক কুরবানী কর, তখন আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হই আর ভাবি যে, আজ আমি হযরত আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে এগিয়ে যাব। কিন্তু আবু বকর (রা.) আমার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন আর তার সাথে যেহেতু মহানবী (সা.)-এর সম্পর্কও ছিল এবং তিনি (সা.) জানতেন যে, তিনি কিছুই ছেড়ে আসেন নি, তাই তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! ঘরে কী রেখে এসেছ? তিনি বলেন, ঘরে খোদা এবং রসূল (সা.)-এর নাম রেখে এসেছি। এ কথা বলে হযরত উমর কাঁদতেন এবং বলতেন, তখনও আমি তাঁর চেয়ে এগিয়ে যেতে পারি নি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এগুলো ছিল তাঁর কুরবানী। হযরত আবু বকর (রা.) পূর্বেও দান করতেন, কিন্তু যখন বিশেষ উপলক্ষ আসে তখন তিনি সবকিছু এনে উপস্থাপন করেন। একদিকে ছিলেন এরা আর অপরদিকে রয়েছে তারা যারা নিজেদের সম্পদের এক-দশমাংশ কুরবানী করারও সৌভাগ্য পায় না অথচ বলে বেড়ায় যে, আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম।

মৃত্যুবরণের সময় হযরত উমর (রা.)-এর চোখ বার বার অশ্রুসজল হয়ে উঠত আর তিনি বলতেন, হে খোদা! আমি কোন পুরস্কারের যোগ্য নই। আমি কেবল শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে চাই। অতঃপর দাফন এবং জানাযা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ তাকে গোসল দেন। হযরত ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদে নববীতে হযরত উমরের জানাযার নামায আদায় করা হয় আর হযরত সোহায়েব তাঁর জানাযার নামায পড়ান। মহানবী (সা.)-এর মিম্বর ও কবরের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর জানাযার নামায আদায় করা হয়। হযরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমরকে কবরে নামানোর জন্য উসমান বিন আফফান, সাঈদ বিন যায়েদ, সোহায়েব বিন সিনান আর আব্দুল্লাহ্ বিন উমর নেমেছিলেন। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুতে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত) (উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, চতুর্থ এডিশন ২০০৩ সালে মুদ্রিত)*

তাদের ছাড়া হযরত আলী, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত তালহা আর হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম এর নামও পাওয়া যায়। *[সৈয়দনা হযরত উমর ফারুক আযম (রা.), প্রণেতা মুহাম্মদ হোসেন হায়কাল, অনূদিত ১৬৭-১৬৮ সাল, ইসলামী কুতুব খানা লাহোরে মুদ্রিত] (আল-ফারুক, প্রণেতা শিবলি নো'মানী, পৃষ্ঠা: ১৬৯, দারুল ইশাআত করাচী থেকে ১৯৯১ সালে মুদ্রিত)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, পুণ্যবানদের পাশে দাফন হওয়াও এক নেয়ামত। হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে লিখিত আছে যে, মৃত্যু শয্যায় থাকা অবস্থায় তিনি হযরত আয়েশার কাছে বার্তা পাঠান যে, মহানবী (সা.)-এর (কবরের) পাশের জায়গাটি যেন তাকে দেয়া হয়। হযরত আয়েশা (রা.) ত্যাগ স্বীকার করে সেই স্থানটি তাকে দিয়ে দিলে তিনি বলেন, 'মা বাকেয়া লী হাম্মুন বা'দা যালিক' অর্থাৎ এখন এরপর আমার আর কোন দুঃখ নেই যখন কিনা আমি মহানবী (সা.)-এর রওজায় সমাহিত হব। *(মালফুযাত, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৬)*

অপর এক স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আগ্রহের সাথে আল্লাহ্ তা'লার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে তাকে তিনি কখনও বিনষ্ট করেন না যদিও জগতের প্রতিটি বস্তুই তার শত্রু হয়ে যাক না কেন। আর আল্লাহ্‌র সন্ধানী কোন ক্ষতি বা কষ্টের সম্মুখীন হয় না। আল্লাহ্ তা'লা সত্যবাদীদের অবান্ধব ও অসহায় পরিত্যাগ করেন না। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের উভয়ের অর্থাৎ আবু বকর ও উমরের সততা ও নিষ্ঠা কতই না উন্নতমানের! তারা উভয়ে এমন বরকতমণ্ডিত সমাধিস্থলে সমাহিত হয়েছেন যে, মূসা ও ঈসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন তাহলে শত ঈর্ষার সাথে সেখানে সমাহিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন, কিন্তু এই মর্যাদা কেবল বাসনা থাকলেই লাভ হতে পারে না, আর কেবল চাইলেই তা প্রদান করা যায় না, বরং এটি তো সর্বাধিপতি খোদার পক্ষ থেকে এক স্থায়ী কৃপা আর এই কৃপা কেবল সেসব লোকের প্রতিই অবতীর্ণ হয় যাদের প্রতি ঐশী অনুগ্রহ সদা সক্রিয় থাকে। *(রূহানী খাযায়েন, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৬)*

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর যখন মৃত্যু পথযাত্রী ছিলেন তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর চরণে সমাহিত হওয়ার মানসে পরম ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। অতএব তিনি হযরত আয়েশাকে বলে পাঠান যে, আপনি অনুমতি দিলে আমি তাঁর (সা.)-এর পাশে

সমাহিত হতে চাই। হযরত উমর সেই মানুষ ছিলেন যার সম্পর্কে খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরাও লিখে যে, তিনি এমনভাবে রাজত্ব করেছেন যা জগতে আর কেউ করে নি। তারা অর্থাৎ খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরা মহানবী (সা.)-কে গালি দেয়, কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর প্রশংসা করে। সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য লাভকারী ব্যক্তি মৃত্যুর সময়ও এই বাসনা ব্যক্ত করেন যে, মহানবী (সা.)-এর চরণে যেন তার ঠাঁই হয়। যদি মহানবী (সা.)-এর কোন একটি কাজেও এই বিষয়টি প্রকাশ পেত যে, তিনি খোদার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন না, তাহলে কি হযরত উমরের ন্যায় ব্যক্তি এরূপ মর্যাদায় উপনীত হয়ে কখনও তাঁর (সা.) চরণে স্থানলাভের বাসনা করতেন? *(আনোয়ারুল উলুম, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬২)*

অতএব এটিই মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা, যার কারণে হযরত উমরেরও তাঁর (সা.) চরণে স্থানলাভের বাসনা হয়েছে। মৃত্যুর সময় হযরত উমর (রা.)-এর বয়স কত ছিল? এ সম্পর্কেও বিভিন্ন মত রয়েছে। জন্মসাল সম্পর্কেও বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে, এ কারণে মৃত্যুর সন সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন উক্তি রয়েছে। যেমন তাবারি, উসদুল গাবা, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, রিয়াযুন নাযারা, তারীখুল খুলাফা ইত্যাদি গ্রন্থের বিভিন্ন রেওয়াতে তাঁর বয়স ৫৩ বছর, ৫৫ বছর, ৫৭ বছর, ৫৯ বছর, ৬১ বছর, ৬৩ বছর এবং ৬৫ বছর বর্ণিত হয়েছে। যদিও সহীহ্ মুসলিম ও তিরমিযির রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর বয়স ৬৩ বছর বর্ণনা করা হয়েছে। *(তারীখুত তাবারী, অনূদিত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১১, দারুল ইশাআত, করাচী থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত) (উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, চতুর্থ এডিশন ২০০৩ সালে মুদ্রিত) (আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৪, দারুল হিজরে ১৯৯৮ সালে মুদ্রিত) (রিয়াযুন নাযরাহ, পৃষ্ঠা: ৪১৮-৪১৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুতে মুদ্রিত) (তারীখুল খুলাফা, প্রণেতা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, অনূদিত পুস্তক, পৃষ্ঠা নং: ১৬৮, মুমতায একাডেমী, লাহোর থেকে মুদ্রিত)*

হযরত আনাস বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মহানবী (সা.)-এর বয়স ছিল ৬৩ বছর, হযরত আবু বকর এর মৃত্যুর সময় বয়স ছিল ৬৩ বছর আর হযরত উমরেরও মৃত্যুর সময় বয়স ছিল ৬৩ বছর। *(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস নং: ৬০৯১) (সুনান তিরমিযী, কিতাবুল মানাকে, হাদীস নং: ৩৬৫৩)*

হযরত উমরের মৃত্যুতে কতিপয় সাহাবীর অভিব্যক্তি– এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, হযরত উমরের পবিত্র শবদেহ জানাযার জন্য রাখা হয় আর মানুষ তাঁর আশেপাশে দাঁড়িয়ে যায়। তাকে উঠানোর পূর্বে তারা দোয়া করতে থাকে। এরপর তারা জানাযার নামায পড়ে আর আমিও তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে চকিত করে। আমি দেখি যে, তিনি হলেন হযরত আলী বিন আবি তালেব (রা.) তিনি হযরত উমরের জন্য রহমত কামনা করে দোয়া করেন আর বলেন, তিনি এমন কোন ব্যক্তিকে রেখে যান নি যে আমার কাছে এই দিক থেকে তার চেয়ে অধিক প্রিয় হবে যে, আমি তার মত আমল করে আল্লাহ্ তা'লার সাথে মিলিত হব। খোদার কসম, আমি এটিই মনে করতাম যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকেও তার সাথীদের সাথেই রাখবেন, অর্থাৎ হযরত উমরকেও তার সাথীদের সাথেই রাখবেন। আর আমি জানি, মহানবী (সা.)-এর কাছে বহুবার আমি এটি শুনেছি যে, তিনি বলতেন, 'যাহাবতু আনা ওয়া আবু বকরীন ওয়া উমর, ওয়া দাখালতু আনা ওয়া আবু বকরীন ওয়া উমর, ওয়া খারাজতু আনা ওয়া আবু বকরীন ওয়া উমর'। অর্থাৎ, আমি এবং আবু বকর আর উমর যাই, আমি এবং আবু বকর আর উমর প্রবেশ করি, আমি এবং আবু বকর আর উমর বের হই। *(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস নং: ৩৬৮৫)*

অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এই বাক্যগুলো তিনি উচ্চারণ করতেন। জাফর বিন মুহাম্মদ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে যখন গোসল করানোর পর কাফনের কাপড় পরিধান করিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে রাখা হয়, তখন হযরত আলী (রা.) তার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তার প্রশংসা করেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এই চাঁদরে আবৃত ব্যক্তির তুলনায় অন্য কেউ এই ধরাপৃষ্ঠে আমার কাছে বেশি প্রিয় নয় যার আমলনামা নিয়ে আমি খোদার দরবারে উপস্থিত হব। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুতে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)*

আবু মাখলাদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী বিন আবি তালেব বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বেই আমরা বুঝতে পারি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর আমাদের মাঝে হযরত আবু বকর সর্বোত্তম ব্যক্তি। আর হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পূর্বেই আমরা বুঝতে পারি যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর অবর্তমানে হযরত উমর (রা.) আমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি। *(সীরাতে উমর ইবনুল খাত্তাব, প্রণেতা ইবনে জাওযী, পৃষ্ঠা: ২১২, মিশরের আল আজহার প্রেসে মুদ্রিত)*

জায়েদ বিন ওয়াহাব বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)-এর নিকট গেলে তিনি হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এত বেশি কাঁদেন যে, তার চোখের জলে কঙ্কর পর্যন্ত সিক্ত হয়ে যায়। এরপর তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) ইসলামের সুরক্ষিত দুর্গ ছিলেন, মানুষ এতে প্রবেশ করে আর বের হত না। তিনি একটি দৃঢ় দুর্গসদৃশ ছিলেন যাতে প্রবেশের পর মানুষ আর বের হত না। তার মৃত্যুতে এই দুর্গে ফাঁটল সৃষ্টি

হয়েছে এবং মানুষ ইসলাম পরিত্যাগ করছে। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্‌, বৈরুতে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)*

আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর জ্ঞান যদি এক পাল্লায় আর অন্য সকল মানুষের জ্ঞান অপর পাল্লায় রাখা হয় তবে হযরত উমরের পাল্লা ভারী হবে। আবু ওয়ায়েল বলেন, ইব্রাহীমের কাছে আমি এর উল্লেখ করলে তিনি বলেন, খোদার কসম! বিষয়টি এরূপই, আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসঊদ (রা.) এর চেয়েও বড় কথা বলেছেন। আমি জিজ্ঞেস করি যে, তিনি কী বলেছেন? তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি বলেন যে, জ্ঞানের দশ ভাগের নয় ভাগ হারিয়ে গেছে। *(উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ ঠা: ৬৫১, দারুল ফিকর বৈরুত থেকে ২০০3 সালে মুদ্রিত)*

হযরত আনাস (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাত হলে হযরত আবু তালহা (রা.) বলেন, আরবে শহুরে বা গ্রাম্য এমন কোন ঘর নেই যেটি হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্‌, বৈরুতে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)*

অর্থাৎ, তিনি সবার এতটা সাহায্য-সহযোগিতা করতেন যে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা প্রভাবিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন সালাম (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর জানাজার পর হযরত উমর (রা.)-এর খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, হে উমর! আপনি কতইনা উত্তম মুসলিম ভাই ছিলেন, সত্যের জন্য উদার এবং মিথ্যার জন্য কৃপণ ছিলেন। সন্তুষ্টি প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনি সন্তুষ্ট হতেন এবং ক্রোধের সময় আপনি রাগ করতেন। আপনি পবিত্র দৃষ্টি ও বড় মনের মানুষ ছিলেন। অহেতুক প্রশংসাকারীও ছিলেন না আর গীবত তথা পরনিন্দাকারীও ছিলেন না। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্‌, বৈরুতে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)*

একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুতে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) যখন কাঁদছিলেন তখন জনৈক ব্যক্তি বলেন, হে আবুল আ'ওর! আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বলেন, আমি ইসলামের জন্য কাঁদছি। নিশ্চিতভাবে হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুতে ইসলামে এমন বিপত্তি দেখা দিয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হবে না। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্‌, বৈরুতে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)*

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর জীবদ্দশায় আমরা বলতাম, মহানবী (সা.)-এর উম্মতে তাঁর পর সর্বোত্তম হলেন হযরত আবু বকর (রা.), এরপর হযরত উমর (রা.), অতঃপর হযরত উসমান (রা.)। *(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৬২৮)*

হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ইসলামের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত ছিল যে ক্রমাগতভাবে উন্নতির পথে ধাবমান ছিল। তাঁর শাহাদাতে সেই যুগ পিঠ ফিরিয়ে নেয় আর এখন অনবরত পেছনের দিকে যাচ্ছে। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্‌, বৈরুতে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)*

হযরত উমর (রা.)-এর সহধর্মিণী ও সন্তানদের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন সময় তাঁর দশজন সহধর্মিণী ছিলেন যাদের গর্ভে নয়জন পুত্র ও চার জন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাদের মাঝে একজন ছিলেন হযরত হাফসা (রা.) যিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হযরত যয়নব বিন মাযঊন ছিলেন প্রথম স্ত্রী যিনি হযরত উসমান বিন মাযঊনের সহোদরা ছিলেন এবং যার গর্ভে হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্‌, আব্দুর রহমান আকবর এবং কন্যা হযরত হাফসার জন্ম হয়।

(তাঁর সহধর্মিণী) হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আলী বিন আবু তালেবের গর্ভে যায়েদ আকবর এবং রুকাইয়্যার জন্ম হয়। মোলায়কা বিনতে যারওয়াল যিনি উম্মে কুলসুম নামেও সুপরিচিত। তার গর্ভে যায়েদ আসগার এবং উবায়দুল্লাহ্‌র জন্ম হয়। কুরায়বা বিনতে আবু উমাইয়া মাখযুমী। যেহেতু মোলায়কা এবং কুরায়বা ঈমান আনেন নি তাই হযরত উমর (রা.) ষষ্ঠ হিজরীতে তাদের উভয়কে তালাক দিয়ে দেন। হযরত জামিলা বিনতে সাবেত, পূর্বে যার নাম ছিল আসিয়া, মহানবী (সা.) তার নাম পরিবর্তন করে জামিলা রাখেন। তিনি সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাসের জন্য পঁচিশ হাজার দিরহাম অথবা রুপার টুকরোর পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মহান সাহাবীদের প্রত্যেকের জন্য পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। মহানবী (সা.)-এর অন্যান্য সাহাবীদের বাৎসরিক তিন হাজার রুপার টুকরো দিয়ে সম্মানিত করা হয়। *(The decline and fall of the Roman empire. by Edward Gibbon. vol.3, chapter LI. page 178 London)*

মাইকেল এইচ হার্ট তার পুস্তক 'দি হানড্রেড'-এ ইতিহাসের একশজন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন করেছেন এবং ১ নম্বরে রেখেছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম আর উক্ত তালিকার ৫২ নম্বরে হযরত উমর (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন, উমর বিন খাত্তাব মুসলমানদের দ্বিতীয় খলীফা এবং সম্ভবত মুসলমানদের মাঝে সবচেয়ে মহান খলীফা ছিলেন।

তিনি মহানবী (সা.)-এর সমসাময়িক যুবক এবং তাঁর ন্যায় মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সন সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই, তবে সম্ভবত ৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি হবে। প্রারম্ভিক যুগে হযরত উমর ছিলেন মহানবী (সা.)-এর নবধর্মের সবচেয়ে কঠোর শত্রু, কিন্তু হঠাৎ-ই হযরত উমর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এরপর তিনি তাঁর (সা.) শক্তিশালী সাহায্যকারী হয়ে যান। সেইন্ট পল-এর খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার সাথে তাঁর ইসলাম গ্রহণের অদ্ভূতসাদৃশ্য রয়েছে। উমর মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকটতম উপদেষ্টাদের অন্তর্ভুক্ত হন এবং তাঁর (সা.) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এমনই ছিলেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে নিজের কোন স্থলাভিষিক্ত মনোনীত না করেই মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেন। উমর তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাথী ও শ্বশুর আবু বকরের খিলাফতের প্রতি সমর্থন জানান; ফলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব টলে যায়। তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে লিখেছেন, কেননা তারা মানতে প্রস্তুত নয় যে, মানুষজন ঐক্যবদ্ধভাবে তাকে খলীফা নির্বাচিত করেছে। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বলেন যে, উমর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্বশুরের হাতে বয়আত করেন, যার ফলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রশমিত হয়ে যায় এবং এর ফলে আবু বকরকে সর্বস্বীকৃতভাবে প্রথম খলীফা, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মানা হয়। আবু বকর একজন সফল নেতা ছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল দু'বছরের জন্য খলীফা হিসেবে দায়িত্বপালনের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে তার অবর্তমানে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি হিসেবে উমরের নাম প্রস্তাব করেন। উমর ছিলেন মহানবী (সা.)-এর শ্বশুর; ফলে আরেকবার ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব টলে যায়। তিনি (মাইকেল এইচ. হার্ট) বিষয়টিকে জাগতিকরূপ দিতে চাচ্ছেন; যাহোক তিনি প্রশংসা করছেন। উমর ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে খলীফা হন এবং ৬৪৪ সাল পর্যন্ত খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে অর্থাৎ খিলাফতে অধিষ্ঠিত অবস্থায় একজন ইরানি ক্রীতদাস মদিনায় তাঁকে শহীদ করে। তিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁর অবর্তমানে স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন, যা এভাবে আরেকবার ক্ষমতা নিয়ে সম্ভাব্য সশস্ত্র যুদ্ধ টলিয়ে দেয়। এই কমিটি উসমানকে তৃতীয় খলীফা নির্বাচন করে, যিনি ৬৪৪ সাল থেকে ৬৫৬ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। অতঃপর তিনি লিখেন, হযরত উমর (রা.)-এর এই দশ বছরের খিলাফতকালেই আরবরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজয়গুলো লাভ করে। তাঁর খিলাফতের সংক্ষিপ্ত সময়েই আরব বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যাধীন সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন আক্রমণ করে। ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে আরব বাহিনী বাইজেন্টাইন তথা রোমানদের বিরুদ্ধে ইরারমূকের যুদ্ধে এমন বিরাট জয় লাভ করে যার ফলে তাদের কোমর ভেঙে যায়। একই বছর দামেস্ক বিজয় হয়। অতঃপর দু'বছর পর জেরুযালেম অস্ত্রসমর্পণ করে। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরব বাহিনী গোটা ফিলিস্তিন এবং সিরিয়া জয় করে নেয় আর বর্তমান তুরস্কের দিকে অগ্রসর হয়। ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে আরবরা রোমান সাম্রাজ্যাধীন মিশরে প্রবেশ করে। তিন বছরের মধ্যে তারা পুরো মিশরে আধিপত্য বিস্তার করে। হযরত উমর (রা.) খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই আরবরা পারস্য সাম্রাজ্যাধীন ইরাক আক্রমণ করে। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে কাদসিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে আরবদের মূল বিজয় সূচিত হয়। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের ভেতর গোটা ইরাক আরবদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে আর তারা এখানেই থেমে থাকে নি বরং এরপর তারা পারস্য তথা ইরানেও আক্রমণ করে। ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তারা পারস্যের সর্বশেষ বাদশাহ্‌র সেনাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।

হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর সময়, অর্থাৎ ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম ইরানের অধিকাংশ অঞ্চল আরবদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুতেও আরব সেনাবাহিনী দমে যায় নি। পূর্ব দিকে তারা দ্রুততম সময়ে পারস্য বিজয় নিশ্চিত করে আর পাশাপাশি পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তিনি (মাইকেল এইচ. হার্ট) লিখেন, উমরের বিজয়াভিযানের ব্যাপ্তি যতটা তাৎপর্যপূর্ণ, এই বিজিত অঞ্চলগুলোর দৃঢ়তাও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ইরানিরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু অবশেষে তারা আরব-শাসন থেকে বেরিয়ে যায়, যেখানে সিরিয়া, ইরাক এবং মিশরের অধিবাসীরা এমনটি করে নি। তারা আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে একাকার হয়ে যায় এবং আজ অবধি এমনই আছে। তিনি আরও লিখেন, নিঃসন্দেহে উমর (রা.)-কে তার সেনাবাহিনী কর্তৃক বিজিত বিশাল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার স্বার্থে নিয়মনীতি প্রণয়ন করতে হয়েছে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বিজিত অঞ্চলসমূহে আরবদের যেন একটি বিশেষ সামরিক অবস্থান লাভ হয় এবং তারা স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে পৃথকভাবে সেনানিবাসে অবস্থান করে। মুসলমান আরব বিজেতাদেরকে অধীনস্থ লোকদের কেবল একটি কর দিতে হত। তাদের পুরো শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছিল। এছাড়া তাদের ওপর আর কোন দায়িত্ব ছিল না; বিশেষত মুসলমান হওয়ার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা হত না। উক্ত কথা দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে, আরবের এসব অভিযান বা যুদ্ধ ধর্মীয় লড়াই থেকে বেশি জাতিগত বিষয় ছিল। যদিও ধর্মীয় দিক ছিল না– তা বলা যাবে না। উমর (রা.)-এর সফলতা নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর ইসলামের বিস্তারে মূল ব্যক্তিত্ব তিনিই ছিলেন। তার (রা.) এই দ্রুত অর্জিত বিজয় ব্যাতিত সম্ভবত আজ ইসলাম যতটা বিস্তৃত রয়েছে, ততটা

বিস্তৃতি লাভ করত না। অধিকন্তু হযরত উমর (রা.)-এর যুগে বিজিত ভূখণ্ড আজও আরব অঞ্চল হিসেবেই বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (সা.), যিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলেন, অধিকাংশ উন্নতির কৃতিত্ব তারই প্রাপ্য। কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর ভূমিকা অস্বীকার করাও মস্তবড় ভুল হবে। তার (রা.) বিজয় মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রভাবাধীন থাকার ফলাফলস্বরূপ এমনিতেই হয়ে যায় নি। কিছুটা বিস্তৃতি অবশ্যই নির্ধারিত ছিল, কিন্তু সেই অসাধারণ সীমা পর্যন্ত নয় যতটা হযরত উমর (রা.)-এর যোগ্য নেতৃত্বে লাভ হয়েছে। পুনরায় তিনি লিখেন, পশ্চিমা বিশ্বের কাছে উমর (রা.)-এর মত অপরিচিত ব্যক্তিত্বকে শারলিমান এবং জুলিয়াস সিজারের মত প্রখ্যাত ব্যক্তিদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার আখ্যা দেয়া হয়ত বিস্ময় সৃষ্টি করবে, কিন্তু উমর (রা.)-এর যুগে আরবের বিজয়গাথা শারলিমান (Charlemagne) এবং জুলিয়াস সিজারের তুলনায় এর বিশালতা এবং সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব রাখে। *(The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History by Michael H. Hart pages 271 to 275 Golden Books centre Sdn. Bhd. 2008)*

এরপর একজন প্রফেসর যিনি ফিলিপ কে. হিট্টি (Philip K.Hitti) তার পুস্তক 'হিস্ট্রি অব দি আরব'-এ লিখেন, সরল প্রকৃতিসম্পন্ন, মিতব্যয়ী এবং মহানবী (সা.)-এর গতিশীল ও যোগ্য উত্তরসূরী উমর (রা.), যিনি লম্বা এবং সুঠাম দেহ বিশিষ্ট ছিলেন এবং স্বল্পকেশী ছিলেন, তিনি (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর কিছুদিন ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন যাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তার পুরো জীবন এক মরু-নেতার ন্যায় সরলতার মাঝে অতিবাহিত করেছেন। মূলত উমর (রা.), যার নাম মুসলিম রেওয়ায়েত অনুসারে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মদ (সা.) এর পর সবচেয়ে মহান ছিল; তাকে মুসলমান ঐতিহাসিকরা তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা এবং সরলতার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে এবং খলীফার মাঝে বিদ্যমান সকল গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। পুনরায় লিখেন, তার উন্নত চরিত্র সকল বিবেকসম্পন্ন স্থলাভিষিক্তের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বলা হয়, তার কাছে কেবলমাত্র একটি জামা এবং একটি আচকান ছিল আর দুটোতেই স্পষ্টভাবে তালি দেখা যেত। তিনি সামান্য খেজুরের পাতার বিছানায় ঘুমাতেন। ঈমানের দৃঢ়তা, ন্যায়ের রাজ তথা ইসলামের উন্নতি এবং নিরাপত্তা ছাড়া তার অন্য কোন চিন্তা ছিল না। *(History of The Arabs by Philip K. Hitti, 10th edition, page 175, London 1989)*

এই বর্ণনা আগামীতেও ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব যাদের মাঝে সর্বপ্রথম মোকররমা সাহেবযাদী আসেফা মাসুদা বেগম সাহেবার স্মৃতিচারণ করা হবে। তিনি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের ছেলে ডাক্তার মির্যা মোবাশ্বের আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৌহিত্রী এবং হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা ও হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-এর পুত্রবধূ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। তার অবর্তমানে তিনি এক পুত্র এবং চার কন্যা রেখে গেছেন। তার ছেলে তারেক আকবর সাহেব বলেন, আম্মি সর্বদা জামা'তের প্রতি এবং যুগ-খলীফার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। সর্বদা জামা'তের সেবা করার এবং ওসীয়্যতের শর্ত পূরণের চেষ্টা করতেন। তিনি তার জীবদ্দশায় হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করেছেন। প্রত্যেক বছর মরহুমদের পক্ষ থেকে চাঁদা প্রদান করতেন। দরিদ্রদের গোপনে মুক্তহস্তে দান করতেন। কর্মচারীদের বিষয়ে আমাকে তিনি সর্বদাই বলতেন, এরা তোমার ভাই-বোনের মত, অতএব এদের খেয়াল রেখ। তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন যেন তাদের কোনরূপ কষ্ট না হয়। নামাযে নিয়মিত এবং আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক আদায়কারী একজন মহিলা ছিলেন। তার পুত্রবধূ নাঈমা সাহেবা বলেন, আমেরিকায় আমাদের ঘরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে তিনি বলেন, এই ঘরে জিনিসপত্র ঢুকানোর পূর্বে প্রতিটি কক্ষে ও কোণায় নফল পড়ে নিও। তিনি আরও বলেন, আমার মায়ের মৃত্যুর পর তিনি আমাকে বলেন, তুমি ভাববে না যে, তুমি মাতৃহীন, আমি তোমার মা। আর সত্যিই তার ভালবাসাপূর্ণ এবং দোয়াগো ব্যক্তিত্ব আমাকে নিজ মেয়েদের চেয়েও বেশি ভালবাসা দিয়েছে।

এরপর তিনি সর্বদা এই নসীহত করতেন যে, খিলাফতের সাথে কখনও সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। আমার সাথে তার বিভিন্নভাবে আত্মীয়তা ছিল, কেননা তিনি অন্য মায়ের দিক থেকে আমার দাদীর বোনও ছিলেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আমার দাদীও ছিলেন আর খালাও ছিলেন আবার ফুপুও ছিলেন। এসব আত্মীয়তা সত্ত্বেও তিনি বলতেন, আমি শুধু যুগ-খলীফার অনুগত। এগুলো কেবল কথার কথা নয়, বরং সত্যিকার অর্থেই যুগ-খলীফার সাথে তার এই সম্পর্ককে তিনি বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করেছেন। অজস্র দান-খয়রাত করতেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা জামা'তের বিভিন্ন বুযুর্গ ও শিক্ষক, এমনকি কাদিয়ানের বিভিন্ন কর্মচারীর পক্ষ থেকেও নিজেই আদায় করতেন। যখন কোন কর্মচারী বিদায় নিত, তখন তিনি কিছু-না-কিছু দিয়ে

তাকে বিদায় দিতেন এবং এটিও বলতেন যে, যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা করে দিও। তার এক কন্যা শাহেদা বলেন, ছোট বয়সেই আমাদের মা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে পরিচিত করে দিয়েছেন। তিনি বলতেন, জুতার ফিতাও যদি চাইতে হয়, খোদা তা'লার কাছে চাও আর বেশি বেশি দোয়া কর। আর খিলাফতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিষয়ে তিনি অনেক নসীহত করতেন। খলীফা নির্বাচনের সময় এলে তিনি বলেছিলেন, যিনিই খলীফা নির্বাচিত হবেন তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে আর একথাও বলতেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সবুজ-সতেজ শাখা হওয়ার জন্য দোয়া করবে, শুষ্ক শাখা হবে না আর কারও পদস্খলনের কারণ হবে না।

এরপর তার কন্যা নুসরত জাহান বলেন, আমাদের ছোট বয়স থেকেই তরবিয়তের বিষয়টি তিনি দৃষ্টিপটে রেখেছেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় কোন আয়াতে থেমে গিয়ে আমাদেরকে সেই আয়াতের মর্ম বুঝাতেন বা অন্য কোন নসীহত করতেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সর্বদা অতীত বুযুর্গদের স্মৃতিচারণ করতেন। অনেক অমূল্য ও শিক্ষণীয় ঘটনা তার জানা ছিল, যা তিনি অধিকাংশ সময়ই পুনরাবৃত্তি করতেন এবং আমাদেরকে শোনাতেন।

হযরত নবাব আমাতুল হাফীয সাহেবার কন্যা লাহোর জেলার লাজনার সদর ফৌজিয়া শামীম সাহেবা বলেন, তিনি এক অসাধারণ নারী ছিলেন। যখনই তাকে চাঁদার জন্য বলা হত তিনি আশ্বস্ত হলে মন খুলে চাঁদা দিতেন। তিনি কখনও মৌখিকভাবে আবার কখনও চিরকুটে লিখে চাঁদার ওয়াদা করতেন আর মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করতেন। তিনি চাঁদা আদায়ের পাশাপাশি একথাও বলতেন যে, এই চাঁদার কথা কোথাও যেন উল্লেখ না করা হয়। নিতান্তই সরল মহিলা ছিলেন। ব্যক্তিগত বিষয়াদীতে তিনি খুবই সাদাসিধে ছিলেন, এমনকি কিছু লোকের ধারণায় তিনি ছিলেন কৃপণ, কিন্তু নিজে সাদাসিধে থাকলেও দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে ছিলেন উদার। তিনি বলেন, একবার আমি মসজিদের জন্য নিজ অঞ্চলে চাঁদার আহ্বান জানাই, এ বিষয়ের উল্লেখ করলে তিনি বৃহৎ অঙ্কের টাকা, অর্থাৎ প্রায় এক কোটি রুপি চাঁদা হিসাবে আমাকে পাঠিয়ে দেন।

এরপর তার দৌহিত্রী রাযিয়া বলেন, শৈশব থেকেই তিনি অনেক ভাল ভাল কথা বলতেন এবং দিকনির্দেশনা দিতেন। ছোট বয়স থেকেই ভবিষ্যত সৌভাগ্যের জন্য দোয়া করার নসীহত করতেন। পুণ্যবান স্বামী লাভের জন্য দোয়া করার নসীহত করতেন। কম বয়সে লজ্জা পেলে বলতেন, আল্লাহ্ তা'লার কাছে বলতে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়, তাঁর কাছে মন খুলে চাও। ধর্মীয় পুস্তকাদি নিয়মিত পড়তেন আর অধিকাংশ সময় সফরকালে দোয়া ও দোয়া সম্পর্কিত কবিতা পড়তেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন আর তার সন্তানদের ও পরবর্তী প্রজন্মকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ কাজাকিস্তানের প্রাক্তন আমীর রোলান সাইন বাইফ সাহেবের স্ত্রী মোকাররমা ক্লারা আপা সাহেবার। তিনি গত মাসে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ কাজাকিস্তানের মুবাল্লেগ আতাউর রব চিমা সাহেব লিখেন, ৯৪ বা ৯৫ সালের দিকে তিনি বয়আত করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি কাজাকিস্তানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যা ছিলেন। তার স্বামী মোহতরম রোলান সাইন বাইফ সাহেব কাজাকিস্তানের প্রথম আমীর এবং রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টাও ছিলেন এবং কাযাখ ভাষার একজন প্রখ্যাত লেখকও ছিলেন। ক্লারা সাহেবা নিজেও বেশ ভাল অনুবাদক ও লেখিকা ছিলেন। কাজাকিস্তানে জামা'ত প্রতিষ্ঠার গৌরব ক্লারা সাহেবা ও তার স্বামী মোহতরম রোলান সাহেবেরই প্রাপ্য। মোহতরমা ক্লারা সাহেবা কাযাখ ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদও করেছেন যদিও সেটি প্রকাশিত হয় নি, তথাপি এর মাধ্যমে জামা'তের প্রতি তার ভালবাসা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে যে, তিনি আকুল হয়ে কাজাকিস্তান জামা'তকে ফুলেফলে সুশোভিত দেখতে চাইতেন আর এর জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। স্থানীয় মোল্লারা বিরোধিতার ক্ষেত্রে এই পরিবারের কথা উল্লেখ করার সময় এ কথা অবশ্যই বলে যে, এরা আহমদী আর এরাই কাজাকিস্তানে আহমদীয়াত নিয়ে এসেছে। মরহুমা ক্লারা সাহেবার মেয়ে মারবা সাসিন বাইবা লিখেন, আমার মা খুব ভাল অনুবাদক ছিলেন। বহুমুখী ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি খুবই পরিষ্কার ও উজ্জল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ৯৫ সালে লন্ডনে স্থাপিত কাজাকিস্তানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'হাউস অফ আবায়ী' এর একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। লন্ডনে বসেই তিনি তার পুস্তক 'কাজাকিস্তান' লিখেছিলেন আর সে সময়ই তিনি জামা'তের সাথে পরিচিত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর হাতে বয়আত করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি শুধু তার সন্তানদেরই মা ছিলেন না বরং তাদের জন্যও মাতৃতুল্য ছিলেন যারা তার কাছে সাহায্য ও পরামর্শের জন্য আসত।

নুরেম তাইবেক সাহেব বলেন, জামা'তের সকল যুবক আহমদীর জন্য এবং সার্বিকভাবে পুরো জামাতে আহমদীয়া কাজাকিস্তানের জন্য তিনি একজন মায়ের ভূমিকা পালন করতেন। তিনি আরও বলেন, আমি দশ বছর ক্লারা সাহেবার সেই যুগ দেখেছি যার প্রাথমিক তিন বছর অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আর কখনও কখনও এক পাহাড়ের মত দণ্ডায়মান থেকে তিনি জামা'তের সুরক্ষায় ও জামা'তের সেবায় লেগে থাকতেন। বয়স, অসুস্থতা, অন্যান্য বিষয়াদী ও পুস্তকাদি প্রণয়ন ইত্যাদি কারণে

পরবর্তীতে তিনি অনেক ব্যস্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু আন্তরিকভাবে সর্বদা জামা'তের কাজে আত্মনিয়োগ এবং খিলাফত ও জামা'তের সাথে সর্বদা নিষ্ঠার সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টায় থাকতেন।

অতঃপর বলেন, রোলান সাহেব ও ক্লারা সাহেবাকে কাজাকিস্তানে দীর্ঘসময় ধরে দেশপ্রেম ও জাতির উন্নতির প্রতীক বলে মনে করা হত। রোলান সাহেবের সফলতার বড় অংশ ক্লারা সাহেবার কাছে ঋণী। তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ কাজাকিস্তানের একজন সক্রিয় সদরই ছিলেন না, বরং জামা'ত আহমদীয়া কাজাকিস্তানের প্রথম আমীরের একজন শিক্ষিকাও ছিলেন বটে। তিনি বলেন,আমার মনে আছে ৯৬ থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত অথবা এর পরেও তিনি খুবই চমৎকারভাবে জামা'তের মিশন হাউসে লাজনাদের সাপ্তাহিক ক্লাসে সুচারুরূপে লাজনাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতেন। লাজনারা মুরব্বী সাহেবের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করত আর তাদেরকে সেসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হত। এরপর তিনি বলেন, জামা'তে আহমদীয়ার পুস্তকাদির অনুবাদ ক্লারা সাহেবার চেয়ে ভাল আর কেউ করতে পারত না। ক্লারা সাহেবা সকল বুযুর্গ আহমদীর মধ্যে সর্বোত্তম আহমদী ছিলেন যে কারণে তিনি জামা'তের যুবক বয়সের আহমদীদের জন্য আধ্যাত্মিক তরবিয়তের এক মাধ্যম ছিলেন। তার মাঝে জামা'তী মূল্যবোধ তথা প্রকৃত ইসলামের প্রেরণা ছিল। বিপদের সময়ও তিনি কখনও মনোবল হারাতেন না, বরং সবসময় নিজে এবং অন্যদেরও বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং কাজাকিস্তানে আহমদীয়াত প্রসারের ক্ষেত্রে তার যে প্রচেষ্টা ছিল তা সফল করুন, তার দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ উইং কমান্ডার আব্দুর রশিদ সাহেবের, যিনি গত মাসে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার ছেলে ফারুক বলেন, তার পিতার নাম বাবু শেখ আব্দুল আযিয, যিনি মজলিস কারপরদাযের সেক্রেটারি ছিলেন এবং তার জ্যাঠা ছিলেন খান সাহেব ফারযান্দ আলী খান সাহেব, যাকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জামা'তের ইতিহাসে লাহোরের প্রথম আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তার পিতা যুবক বয়সে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, রশিদ সাহেব তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। রশিদ সাহেবের পিতার আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে প্রথম স্ত্রী, দুই কন্যাসন্তানকে রেখে চলে যায়। এরপর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং সেই ঘরে রশিদ সাহেবের জন্ম হয়। তিনি বলেন, পিতামাতার খুবই আজ্ঞানুবর্তী ছিলেন, তাদের সেবা করতেন, আনুগত্যের সাথে তাদের সব কথা মান্য করতেন। পাকভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত পিতা কাদিয়ানেই শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর বলেন, দেশবিভাগের সময় তিনিও অন্যান্য কাফেলার সাথে কাদিয়ান থেকে লাহোরে পৌঁছেন এবং প্রথম দিকের কয়েকটি পরিবারের সাথে পিতামাতাসহ রাবওয়াতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ৫৪ সালের দিকে তিনি এয়ার ফোর্সে কমিশন নেন এবং বিভিন্ন এয়ার বেইসে নিযুক্ত থাকেন। তিনি যেখানেই ছিলেন আহমদীয়াতের প্রচার করতেন। তাকে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে লিবিয়াতে কিছু সময়ের জন্য ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছিল, যদিও তার ফাইলে লিখা ছিল তিনি কাদিয়ানী, যেতে পারবেন না, কিন্তু তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তা সত্ত্বেও তাকে প্রেরণ করেন, কেননা তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, তোমার মত এমন অফিসার আমি আর কাউকে দেখছি না। তিনি বলেন, আমার পিতা বলতেন, একবার লিবিয়াতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ ছিল। তিনি যখন রাষ্ট্রদূতের অফিসে প্রবেশ করেন তখন তিনি দেখেন যে, রাষ্ট্রদূতের একপাশে আরবী ভাষায় জামা'তের বিরোধিতামূলক বইপুস্তক ও লিফলেট রাখা আছে। অতএব রশিদ সাহেব অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে রাষ্ট্রদূতকে জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কী আর কেন রেখেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, এসব কিছু বৃথা ও অনর্থক, চিন্তা করবেন না। তিনি বলেন, জিয়াউল হক সরকারের পক্ষ থেকে ছাপিয়ে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে যেন আমরা এই দেশে তা বিতরণ করি এবং সকল আরব দূতাবাসে এটি পাঠানো হয়েছে। এরপর তিনি বলেন, ১৯৮২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যখন স্পেনে গিয়েছিলেন তখন সেখানেই তার একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাকে লিবিয়ার আমীর নিযুক্ত করেন এবং তিনি (রাহে.) নিজ হাতে লিখে তাকে নিযুক্তি দেন। তিনি লিবিয়া জামা'তের প্রথম আমীর ছিলেন। নামাযের কথা বলার প্রয়োজন নেই, কেননা একজন মু'মিনের জন্য তা এমনিতেই আবশ্যক, তিনি নামাযে নিয়মিত ছিলেন, সেই সাথে কুরআন তিলাওয়াত ও চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রেও তিনি খুবই সময়নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তার মৃত্যুর পূর্বে তার হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করেছিলেন। ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদা নিজের পক্ষ থেকে এবং বুযুর্গদের পক্ষ থেকে আদায় করতেন। তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর একটি ঘটনা তিনি তার ছেলেকে শুনিয়েছেন। তার ছেলে লিখেন, রাবওয়ার প্রাথমিক দিনগুলোতে কোন এক সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তাকে ডেকে পাঠান, তখন

গরমকাল ছিল। তিনি বলেন, আব্বাজান যখন কক্ষে প্রবেশ করেন তখন হুযূর চাটাইয়ের ওপর শুয়েছিলেন আর তিনি যখন চাটাই থেকে উঠেন তখন হুযূরের দেহে চাটাইয়ের দাগ দেখা যাচ্ছিল। তিনি বলেন, এসব কারণে আমাদের মত শিশুদের হৃদয়েও খিলাফতের প্রতি ভালবাসা এবং আনুগত্যের একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে আর এর অনেক প্রভাবও আমাদের ওপর পড়ে।

১৯৮৪ সালে বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার র‍্যাংক থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন, অতঃপর রাবওয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। এরপর সদর উমুমী এবং বিচার বিভাগে কিছুদিন কাজ করেছেন। দরিদ্রদের লালনকারী এবং সবার অভাবের খোঁজখবর নিতেন। তিনি আরও বলেন, বিদায়লগ্নে তার শেষ ওসীয়্যতও এটিই ছিল যে, দরিদ্রদের খেয়াল রাখবে। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন আর সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ আমেরিকা নিবাসী জনাব করীম আহমদ নাঈম সাহেবের সহধর্মিণী মোহতরমা জুবায়দা বেগম সাহেবার। তার মৃত্যুও গত মাসে হয়েছে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত ডাক্তার হাশমত উল্লাহ্ খান সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ ছিলেন। মরহুমা খিলাফতের প্রতি নিবেদিত, পুণ্যবতী এবং নিষ্ঠাবান মহিলা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। তার এক পুত্র মুনিম নাঈম সাহেব হিউম্যানিটি ফার্স্ট যুক্তরাষ্ট্র-এর চেয়ারম্যান। আর তিনি ছিলেন শহীদ ডাক্তার আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের শাশুড়ি। তার কন্যা আমাতুস শাফি, অর্থাৎ ডাক্তার মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের সহধর্মিণী লিখেন, সবার সাথে ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করা তার রীতি ছিল এবং সবার জন্য দোয়া করতেন, বিভিন্ন সুপরামর্শ দিতেন, দরিদ্রদের সাহায্য করতেন। কাছের এবং দূরের সকল আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। যৌবনকাল থেকেই নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা রেখে নিজের জীবন কাটিয়েছেন। আমাদের শৈশব থেকেই আমরা তাকে জুমুআর দিন বিশেষ ইবাদত করে কাটাতে দেখেছি। সময়মত নিজের চাঁদা আদায় করার বিষয়ে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হাফীয আহমদ ঘুমান সাহেবের, যিনি কিছুদিন পূর্বে পরলোক গমন করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পবিত্র কুরআনের অর্থ ও তফসীর অধ্যয়ন করার তার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। একইভাবে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সব বই পড়েছিলেন। রাবওয়াতে জামা'তের কাজ করারও সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি খুবই সময়ানুবর্তী, অতিথিপরায়ণ, শিশুদের প্রতি স্নেহশীল, খুবই সরল প্রকৃতির অধিকারী ও কঠোর পরিশ্রমী একজন মানুষ ছিলেন। সর্বদা যিকরে ইলাহীতে রত থাকতেন। মানুষের প্রতি সহানুভূতি তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, নিজেকে কষ্টের মাঝে ফেলে হলেও অন্যদের প্রশান্তির ব্যবস্থা করতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে তিন পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। তার এক জামাতা কাশেফ হামীদ বাজওয়া সাহেব এখানে আমাদের পি.এস. দপ্তরে মুরব্বী হিসেবে কর্মরত আছেন। তার কন্যা আমতুল কুদ্দূস বলেন, বিনয় ও নম্রতা তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত ছিল। তার পোশাক, ঘরবাড়ি, পানাহার একেবারেই সাদামাটা ছিল। সর্বদা অহংকার বর্জন করে চলতেন। দরিদ্রদের প্রতি সর্বদাই যত্নবান ছিলেন। প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্য কম খরচ করতেন এবং দরিদ্রদের জন্য বেশি খরচ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথেও ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্যকর্মসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

Smile Aid
your complete dental healthcare
Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces
Oral & Dental Surgery
Teeth Whitening
Dental Fillings
Dental Implant
Root Canal Treatment
Orthodontics (Braces)
Dental Crowns, Bridges
In-House Dental X-RAY
Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UJX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid
Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212
Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471
Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

সীরাতুল মাহদী (আ.)

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]

প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)

ভাষান্তর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ

(১৫তম কিস্তি)

৭৪) **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম:** মিয়া ফখরুদ্দীন সাহেব মুলতানি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে একবার তিনি এখানে এসেছিলেন। তিনি জামা'তের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন আর খুব বেশি নিন্দা করতেন। আর এখানে এসেও খুবই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা অব্যাহত রাখেন। তিনি মুলতানে থাকা অবস্থায় বলতেন, আমি যদি কখনও মির্যার সাক্ষাৎ পাই তাহলে (নাউযুবিল্লাহ) তার ওপর অভিশাপ দিব। অর্থাৎ তার সামনেও তাই বলব যা আমি এখানে বলি। যাহোক, আমি তাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন বাইরে বের হলেন তখন তিনি সম্মানের খাতিরে দাঁড়িয়ে যান আর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সরে গিয়ে পিছনে বসেন। সেই সভায় তখন অন্য লোকেরাও উপস্থিত ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বসে থেকেই বক্তৃতা দেয়া শুরু করেন আর কয়েকবার বলেন, আমি তো চাই লোকেরা যেন আমার কাছে আসে, আমার কথা শুনে আর আমাকে প্রশ্ন করে। আমি তো তাদের জন্য খরচ করতেও প্রস্তুত। কিন্তু লোকেরা আসে না, আর যদিও আসে, তারা নিশ্চুপ বসে থাকে আর পিছনে সরে গিয়ে কথা বলে। যাহোক, হুযূর (আ.) একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বক্তৃতা করেন, তবলীগ করেন আর বহুবার তাদের কথা বলতে উৎসাহিত করেন। আমার পিতা খুবই বাকপটু ছিলেন কিন্তু তখন তার মুখে যেন মোহর লেগে গেল আর তিনি একটা কথাও বলতে পারলেন না। সেই সভা থেকে ওঠার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনি কেন সেখানে কোন কথা বলেন নি? তিনি কিছু একটা বলে এড়িয়ে গেলেন। মিয়া ফখরুদ্দীন সাহেব বলতেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেই বক্তৃতায় আমার পিতাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলেন নি, বরং তার বক্তৃতা ছিল সকলের উদ্দেশ্যে।

৭৫) **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম:** আমিরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার গুজরাট নিবাসী একজন হিন্দু কোন এক বরযাত্রীর সাথে কাদিয়ানে আসে। সেই ব্যক্তি সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। সে তার সাথীদের বলল যে, আমরা যেহেতু কাদিয়ানে এসেছি, চল! মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে আসি। তার মনোবাসনা এই ছিল যে, লোকদের সামনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে তার সম্মোহন বিদ্যায় প্রভাবিত করে ভরা মজলিসে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দ্বারা কোন অশালীন আচরণ করাবে। যখন সে মসজিদে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তখনই তার সম্মোহন বিদ্যার মাধ্যমে হুযূরের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে কিন্তু খানিক পরেই সেই ব্যক্তি হঠাৎ চমকে ওঠে। সে নিজেকে সামলিয়ে পুনরায় বসে যায় আর আবারও তার চেষ্টা শুরু করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ আলাপচারিতা অব্যাহত রাখেন কিন্তু পুনরায় সেই ব্যক্তি তার দেহে প্রচণ্ড কম্পন অনুভব করে আর তার মুখ থেকেও কতক ভীতিপ্রদ শব্দ নির্গত হয়, কিন্তু এরপরও সে নিজেকে সংবরণ করে। কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ একটি চিৎকার দিয়ে একেবারে অস্থির হয়ে তার জুতাটা পর্যন্ত না পরে পড়িমরি করে মসজিদ থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। তার সাথীরা আর অন্যান্য লোকজন দৌড়ে গিয়ে তাকে থামায় আর সামলানোর চেষ্টা করে। যখন সে সম্বিৎ ফিরে পায় তখন বলে যে, আমি সম্মোহন বিদ্যায় একজন পারদর্শী ব্যক্তি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর নিজ প্রভাব বিস্তার করে ভরা সভায় তাঁকে দিয়ে কোন অশোভনীয় আচরণ করানো আমার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু যখন আমি প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করি তখন দেখি আমার সামনের দিকে খানিকটা দূরে একটি বাঘ বসে আছে। আমি এটি দেখে আঁতকে উঠি আর নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা দেই যে, এটি আমার বিভ্রম। এরপর আমি পুনরায় মির্যা সাহেবের ওপর

প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা শুরু করলে আবারও সেই বাঘটিকে আমার সামনে পূর্বের চেয়ে অধিক নিকটে দেখি। তখন আমার শরীর পুনরায় প্রকম্পিত হলেও আমি নিজেকে সামলে নেই। আর আমি মনে মনে নিজেকে অনেক ভর্ৎসনা দেই যে, এমনিতেই একটি বিভ্রম থেকে আমার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। অতএব আমি আমার মনকে দৃঢ় করে আর আমার শক্তিকে একীভূত করে পুনরায় মির্যা সাহেবের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করি আর সর্বশক্তি প্রয়োগ করি। তারপর আচমকা আমি দেখি, সেই বাঘটি লফিয়ে পড়ে আমাকে আক্রমণ করছে। তখন আমি আত্মহারা হয়ে চিৎকার দেই আর সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলতেন, পরবর্তিতে সেই ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনেক অনুগামী হয়ে গিয়েছিল। আর যতদিন জীবিত ছিল ততদিন মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর সাথে নিয়মিত পত্রালাপ অব্যাহত রেখেছিল।

৭৬) **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম:** খাকসার বর্ণনা করছি, কপুরথলা নিবাসী মরহুম মুন্সী মোহাম্মদ আরোরা সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্মরণে বলতেন যে, আমরা তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দর্শনপিয়াসী ছিলাম। অসুস্থ হলেও তাঁর (আ.) দর্শনে আমরা আরোগ্য লাভ করতাম। খাকসার বর্ণনা করছি, মরহুম মুন্সী সাহেব পুরোনো নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভালবাসায় বিলীন ব্যক্তিদের মাঝে তার নাম প্রাথমিক পর্যায়ে গণ্য করা যথাযথ হবে।

৭৭) **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম:** হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন খলীফা আওয়াল (রা.) বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোন এক সফরে ছিলেন। স্টেশনে পৌঁছে দেখেন, গাড়ি আসতে এখনও দেরি আছে। তিনি (আ.) নিজ স্ত্রীকে নিয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে পায়চারি করতে লাগলেন। এটি দেখে মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব যিনি অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ও আবেগপ্রবণ ছিলেন, আমার নিকট এসে বলেন, অনেক মানুষ আর গায়র আহমদী মানুষ এদিকসেদিক ঘোরাফেরা করছে। আপনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বিনীত অনুরোধ করুন তিনি যেন তাঁর স্ত্রীকে পৃথক কোন স্থানে বসিয়ে দেন। মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব বলেন, আমি তো বলতে পারব না, আপনিই বলে দেখুন! অনন্যোপায় হয়ে মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব নিজেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করেন, হুযূর! এখানে অনেক মানুষ, বিবি সাহেবাকে অন্য এক জায়গায় বসিয়ে দিন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, যাও! আমি এমন (প্রচলিত ভারসাম্যহীন) পর্দায় বিশ্বাসী নই। মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব বলতেন যে, এরপর মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব মাথা নিচু করে আমার কাছে আসলে আমি জিজ্ঞেস করি, মৌলবী সাহেব! উত্তর কি নিয়ে এসেছেন?

৭৮) **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম:** খাকসার বর্ণনা করছি যে, যখন আমাদের ছোট ভাই মোবারক আহমদ অসুস্থ ছিল সেই সময়ের কথা। একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের ছোট ভাইকে দেখার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-কে ঘরে ডাকেন। সেই সময় তিনি (আ.) উঠানের মাঝে একটি খাটের ওপর বসতেন। আর তখন উঠানে কোন মেঝেও ছিল না। মৌলবী সাহেব এসেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খাটের পাশে মাটিতে বসে যান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মৌলবী সাহেব খাটের ওপর বসুন! মৌলবী সাহেব নিবেদন করলেন, হুযূর! আমি তো বসেছি। তিনি এটি বলে একটু উঁচু হলেন আর হাত খাটের ওপর রেখে দিলেন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবারও বললে হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব উঠে খাটের এক কিনারায় পায়ার ওপর বসে যান। খাকসার নিবেদন করছি, হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেবের মাঝে অনেক উচ্চপর্যায়ের আনুগত্য ও শিষ্টাচারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। ...*(চলবে)*

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহ্‌মদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক-চাঁদা বাকি পড়েছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক-চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহ্‌মদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক-চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন। ওয়াসসালাম।

খাকসার
সেক্রেটারি ইশায়াত
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর পবিত্র জীবনচরিত এবং জামা'তের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপদেশাবলী

মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের

পঞ্চম কিস্তি

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হাকাম ও আদল অর্থাৎ ন্যায়বিচারক ও মিমাংসাকারী।

"আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে সরাসরি এত বেশি মসলা-মাসায়েল শুনেছি যে, যখনই তাঁর বইপুস্তক পাঠ করা হয় তখন মনে হয় যেন এসব কথা আমরা পূর্বেই শুনেছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি দিনের বেলা যা কিছু লিখতেন তা দিনে বা সন্ধ্যার অধিবেশনে এসে বর্ণনা করতেন, এ কারণেই তাঁর সব বইপুস্তক আমাদের মুখস্থ আর আমরা সেসবের অর্থ খুব ভালভাবে বুঝি যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য এবং তাঁর শিক্ষাসম্মত। যদিও কিছু কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যা কেবল ইঙ্গিতরূপে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বইপুস্তকে পাওয়া যায়। তাতে বিস্তারিত উল্লেখ নেই তাই এসব বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে ঐসব লোকের শরণাপন্ন হতে হয় যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। আর তাঁদের কাছ থেকেও যদি কোন বিষয় সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য না হয় তাহলে আমরা কিয়াস বা অনুমান করি এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে কাজ করি যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন। এতদসত্ত্বেও আমার নিজস্ব রীতি হল, কোন বিষয়ে যদি আমি জানতে পারি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বক্তব্য এর বিপরীত তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ আমার মতামত বাতিল আখ্যা দেই। ১৯২২ অথবা ১৯২৮ সালে এই মসজিদেই পবিত্র কুরআনের দরসের সময় আমি 'আরশ' সম্পর্কে একটি নোট বন্ধুদের লিখিয়েছিলাম, যা বেশ দীর্ঘ নোট ছিল, কিন্তু যখন আমি পুরো নোট লেখানো সম্পন্ন করি তখন শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) অথবা মরহুম হাফিয রওশন আলী সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি বের করে আমার সামনে উপস্থাপন করেন এবং বলেন, 'আপনি তো বিষয়টি এভাবে নোট করিয়েছেন কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) (বিষয়টি) এভাবে বলেছেন'। আমি সেই উদ্ধৃতিটি দেখে তৎক্ষণাৎ বন্ধুদের বলে দেই যে, 'আরশ সম্পর্কে আমি আপনাদের যা কিছু লিখিয়েছি তা ভুল, তাই তা আপনারা নিজেদের নোটবুক থেকে কেটে ফেলুন।' অতএব, যারা তখন আমার দরসে উপস্থিত ছিলেন তারা সাক্ষী দিতে পারবেন আর তাদের কাছে যদি তখনকার নোটবুক সংরক্ষিত থাকে তাহলে তা-ও দেখা যেতে পারে যে, আরশ সম্পর্কে নোট লেখানোর পর যখন আমি জানতে পারি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিশ্বাস এর বিপরীত তখন তা নোটবুক থেকে কাটিয়ে দেই এবং বলি, এই পৃষ্ঠাগুলো ছিড়ে ফেল কেননা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিপরীত লিখেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশ বা বক্তব্যের বিপরীতে যদি আমরা আমাদের মতামতে অনড় থাকি আর বলি যে, আমরা যা কিছু বলছি তা-ই সঠিক আর নিজের মিথ্যা আত্মসম্মানের কথা চিন্তা করি তাহলে ধর্ম এবং ঈমানের কিছুই অবশিষ্ট থাকতে পারে না।"

হুযূর (রা.) আরও বলেন, স্মরণ রেখ! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হাকাম ও আদল অর্থাৎ ন্যায়বিচারক ও মিমাংসাকারী। আর কোন অবস্থায়ই তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি শব্দও বলা সঙ্গত নয়। আমরা তাঁর বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে পবিত্র কুরআনের আয়াতের ভিন্ন অর্থ করতে পারি কিন্তু তা কেবল এমন অবস্থায় যে, তার মধ্যে এবং আমাদের বর্ণিত অর্থের মধ্যে যেন কোন বৈপরীত্য বা দ্বিমত না থাকে। আমার একথা বলার অর্থ এটি নয় যে, আমাদের নতুন অর্থ বা ভিন্ন অর্থ করা অবৈধ। নিঃসন্দেহে তোমরা পবিত্র কুরআনের তত্ত্ব বর্ণনা কর আর এক একটি আয়াতের শুধু হাজার হাজার নয় বরং লক্ষ লক্ষ তত্ত্ব ও মর্ম বর্ণনা কর। এসব করা তোমাদের জন্য বৈধ ও সঙ্গত আর আমাদের জন্য আনন্দের কারণও বটে, বরং তোমরা যদি পবিত্র কুরআনের এক একটি আয়াতের শত শত খণ্ডের তফসীরও কর আর তা যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে আমাদের হৃদয় এতে গৌরববোধ করবে; কেননা প্রত্যেক পিতা-ই চায়, তার সন্তান তার চেয়েও বড় আলেম বা বড় জ্ঞানী হোক।

কিন্তু এটি এমন পরিস্থিতিতেই সম্ভব যেন তোমাদের উপস্থাপিত কোন দলীল-প্রমাণ এবং পয়েন্ট হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক বর্ণিত কোন শিক্ষার পরিপন্থী না হয়। তোমরা যদি কোন আয়াতের এমন কোন অর্থ কর যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রত্যাখ্যান করেছেন তাহলে সেই অর্থ বর্জন করা হবে, কিন্তু তাঁর শিক্ষাকে বলবৎ রেখে তোমরা যদি পবিত্র কুরআনের আয়াতের অতিরিক্ত কোন অর্থ বর্ণনা কর তাহলে তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মধ্যস্থতায় বা তাঁর কল্যাণে হবে। আর তাঁর বাগান থেকে আহরিত এবং তাঁর অনুবর্তিতার কল্যাণে হবে। যেমনটি আমরা বর্ণনা করি তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বদৌলতে এবং তাঁর কল্যাণেই করি।"
(খুতবাতে মাহমুদ, উনবিংশ খণ্ড, পৃ: ৫৯৯)

"খোদার ছায়া তাঁর শিরে থাকবে"

রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল্ ফযলের ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০১২ (মুসলেহ্ মাওউদ) সংখ্যায় মোকাররম মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেবের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয় যাতে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত একটি নিদর্শনকে দৃষ্টিপটে রেখে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর পবিত্র জীবনচরিতের কতিপয় দিক আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ "খোদার ছায়া তাঁর শিরে থাকবে"। পাঠকদের উদ্দেশ্যে তা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে। (অনুবাদক)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯৪৪ সনের ২৮শে ডিসেম্বর বার্ষিক জলসায় 'আল্ মাওউদ' বিষয়ে যে যুগান্তকারী বক্তব্য প্রদান করেন তাতে উপরোক্ত নিদর্শনের বরাতে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই এলহামের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য অনবরত আমায় সাহায্য করেছেন আর উপর্যুপরি আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। আর আমি এক্ষেত্রে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাজ শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমাকে হত্যা করতে পারবে না। আমার সাথে লাগাতার এমনসব ঘটনা ঘটেছে যে, মানুষ আমাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বিশেষ কৃপায় আমাকে তাদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ:

প্রথম ঘটনা– আমার অভ্যাস হল, বক্তৃতা দেওয়ার মাঝে আমি গরম চায়ের দু'এক চুমুক পান করি যাতে আমার গলা ঠিক থাকে। এ সময় জলসা গাহ্ থেকে কেউ একজন মালাই-এর একটি বাটি বা পেয়ালা পাঠায় আর বলে, তাড়াতাড়ি এটি হযরত সাহেবের কাছে পৌঁছে দিন কারণ বক্তৃতা দিতে দিতে হুযূর দুর্বল হয়ে পড়ছেন। অতএব, একাধিক হাত বদল হয়ে তা মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মঞ্চে হঠাৎ করে কারও সন্দেহ জাগে আর তিনি সামান্য পরিমাণ মালাই চেখে দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জিহ্বা জড়িয়ে যায়। তখন বুঝা যায় যে, এতে বিষ মেশানো আছে। এখন এই মালাই যদি আমার কাছে পৌঁছে যেত আর আল্লাহ্ না করুন আমি যদি তা চেখে দেখতাম তাহলে আর কিছু না হলেও আমার বক্তৃতা দেওয়া সেখানেই বন্ধ হয়ে যেত।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল– একদা কাদিয়ানে একজন ভারতীয় খ্রিস্টান আসে যার নাম ছিল ম্যাথিউজ আর সে আমাকে হত্যার সংকল্প নিয়ে এসেছিল। এখান থেকে সে যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় তখন কোন কারণে তার স্ত্রীর সাথে তার ঝগড়া বাঁধে আর সে তাকে হত্যা করে বসে। সেই খ্রিস্টান সেশন কোর্টে বিবৃতি দিয়ে বলে, আসল কথা হল, আমার স্ত্রীকে হত্যা করার কোন পরিকল্পনা আমার ছিল না বরং আমি মির্যা সাহেবকে হত্যা করতে চাচ্ছিলাম। আমি কোন জায়গায় এক মৌলবীর বক্তৃতা শুনে অনুপ্রাণিত হই এবং কাদিয়ান গিয়ে আমি মির্যা সাহেবকে হত্যা করার মনস্থ করি। অতএব, আমি পিস্তল নিয়ে কাদিয়ান যাই। ঘটনাক্রমে সেটি জুমুআর দিন ছিল আর অনেক মানুষ মসজিদে সমবেত হয়েছিল। এজন্য তাঁর ওপর আক্রমণ করতে আমি আর সাহস পাই নি। পরের দিন তিনি 'ফেরোচীচী' গমন করেন আর আমিও তাঁর পিছে পিছে 'ফেরোচীচী' পর্যন্ত যাই। কিন্তু সেখানেও সর্বদা তাঁর দরজায় পাহারাদার বসে থাকত, কাজেই সুবিধে করতে না পেরে আমি ফিরে যাই। ঘরে ফিরে আমার স্ত্রীর সাথে আমার কোন কারণে ঝগড়া হয় আর আমি তাকে হত্যা করে বসি। সে এই পুরো ঘটনা আদালতে বর্ণনা করে, অথচ এ সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা ছিল না।

তৃতীয় ঘটনাটি হল– আহরারীদের আন্দোলন যখন তুঙ্গে ছিল। সে সময় আমি একদিন আমার কোঠি **'দারুল হামদ'**-এ অবস্থান করছিলাম। তখন একজন আফগান যুবক আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে। আমার ছোট বাচ্চারা ঘরের ভেতরে এসে বলে, একজন যুবক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এবং সে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। আমি বেরোতে যাব এমন সময় বাইরে হৈ-চৈ শুনতে পাই। এরপর আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়, এই যুবক আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এসেছিল কিন্তু আব্দুল আহাদ সাহেব তাকে ধরে ফেলেছেন এবং তার কাছ থেকে তিনি একটি ছুরিও উদ্ধার করেছেন। আমি আব্দুল আহাদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কীভাবে জানতে পারলে যে, সে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এসেছে? তিনি বলেন, এই যুবক একজন পাঠান আর আমরা পাঠানদের অভ্যাস খুব ভালভাবে জানি। কথা বলতে বলতে সে নিজের পা এমনভাবে নাড়ে যে, আমি তখনই বুঝে ফেলি, সে পায়ের মধ্যে ছুরি লুকিয়ে রেখেছে। এরপর আমি তল্লাশি করতেই ছুরিটি পেয়ে যাই। মেজর সৈয়দ হাবীবুল্লাহ্ শাহ্ সাহেব বলেন, সেই যুবক ঐ জেলখানায় বন্দী ছিল যেখানে আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলাম। আর সে বলত, আমি প্রথমে তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ধর্মশালা পর্যন্ত গিয়েছিলাম কিন্তু আমি সেখানেও ব্যর্থ হই। এরপর আমি কাদিয়ান যাই আর সেখানে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ি।

চতুর্থ ঘটনাটি হল– একবার উম্মে তাহের-এর বাড়ির দেওয়াল টপকে একজন ভেতরে আসতে চাচ্ছিল কিন্তু লোকজন তাকে ধরে ফেলে। পুলিশ

যেহেতু আমাদের বিপক্ষে ছিল তাই তারা একথা বলে তাকে ছেড়ে দেয় যে, 'এই লোক পাগল।' অথচ সে পাগল ছিল না বরং তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন।

পঞ্চম ঘটনাটি গতকালই ঘটেছে। আমাদের ঘরে দুধ রাখা ছিল। কেউ দুধের মধ্যে কিছু মিশিয়েছে বলে আমার স্ত্রীর সন্দেহ হয়। এই সন্দেহের কারণে তিনি বলেন, এই দুধ খাওয়া যাবে না। আরেকজন মহিলা যিনি এ সম্পর্কে জানতেন না অথবা সে মনে করেছে যে, এটি নিছক একটি ধারণা বা সন্দেহ বৈ আর কিছু নয়, তাই সে দুধ পান করে এবং এর ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হল, এখন পর্যন্ত অনবরত সে বমি করে যাচ্ছে। এতে বুঝা গেল, সন্দেহ যা করা হয়েছিল তা সঠিক ছিল।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মানুষ আমাকে বার বার ধ্বংস বা হত্যা করার চেষ্টা করেছে এবং তারা সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি ছিল যে, 'খোদার ছায়া আমার শিরে থাকবে' তাই তিনি সর্বদা আমার নিরাপত্তাবিধান করেছেন আর ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকবেন যতক্ষণ আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি সম্পাদিত না হয়।

ষষ্ঠ ঘটনাটি হল– ১৯৫৪ সনের ১০ই মার্চ হুযূর (রা.) যখন রাবওয়াহর মসজিদে মোবারকে আসরের নামায পড়িয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পেছন থেকে একজন অপরিচিত যুবক তাঁর ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ধারালো ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে। ছুরিটি হুযূরের ঘাড়ের ওপর জীবনশিরার কাছে ডান দিকে আঘাত হানে এবং এর ফলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আক্রমণকারী আবারও আক্রমণ করে কিন্তু নিরাপত্তারক্ষী মোহাম্মদ ইকবাল সাহেব ততক্ষণে মাঝখানে এসে দাঁড়ান। নামাযীগণ অনেক চেষ্টা করে আক্রমণকারীকে ধরে ফেলেন এবং সে সময় তাকে ধরতে গিয়ে আরও অনেকেই আহত হন। রক্তঝরা অবস্থায় হুযূর (রা.) কয়েকজনের সাহায্যে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। পুরো রাস্তায় এবং সিঁড়িতে অনবরত রক্ত ঝরতে থাকে আর এতে হুযূরের পরিধেয় পোশাক রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। সাহেবযাদা ডাক্তার মির্যা মনোয়ার আহমদ সাহেব এবং ডাক্তার হাশমত উল্লাহ্ সাহেব প্রাথমিকভাবে ব্যান্ডেজ করেন এবং ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে তাতে সেলাই করে দেন। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল যে, ক্ষত পৌনে ইঞ্চি গভীর এবং তিন ইঞ্চি প্রশস্ত। কিন্তু রাতের বেলা লাহোর থেকে যখন বিখ্যাত শৈল্যবিদ ডাক্তার রিয়াজ কাদীর সাহেব আসেন এবং তিনি সেলাই খুলে পুরো ক্ষতস্থানটি পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক বলে মনে করেন তখন বুঝা যায়, আঘাত ধারণার চেয়ে অনেক এবং আশঙ্কাজনকও বটে, সোয়া দুই ইঞ্চি গভীর এবং আঘাতটি জীবনশিরার একেবারে নিকটে পৌঁছেছে । এরপর তিনি প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা লাগিয়ে ক্ষতস্থানে অস্ত্রপচার করেন এবং ভেতরে যে শিরা বা ধমনীগুলো কেটে গেছে তার মুখ বন্ধ করে ওপরে সেলাই করে দেন। এই পুরো সময় হুযূর চেতন ছিলেন এবং তিনি তসবীহ্ ও তাহমীদ করছিলেন। তিনি (রা.) আক্রমণ হওয়ার অব্যবহিত পরে মসজিদ থেকে বের হতেই নির্দেশ দেন যে, আক্রমণকারীকে শুধুমাত্র ধরে রাখুন, কোন প্রকার মারধর করবেন না। এই নির্দেশের কারণেই আক্রমণকারীকে নিরাপদে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পরে তদন্তে একথা সত্য বলে প্রমাণিত হয় যে, এটি মূলত পাকিস্তান এবং ইসলামের শত্রুদের জোটবদ্ধ আক্রমণ ছিল এবং এর পেছনে কতিপয় বিদেশী শক্তিও মদদ জুগিয়েছে। কিন্তু খোদা তা'লা সুরক্ষা বিধান করেছেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি (রা.) পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন, যা ছিল মহাপরাক্রমশালী খোদার এক অলৌকিক নিদর্শন। এই দুর্ঘটনার পর খোদার তা'লার প্রবল বিকাশ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-কে তাঁর সব সুসংবাদপ্রাপ্ত ভাইদের চেয়ে দীর্ঘায়ু দান করেন আর অসংখ্য সফলতা ও সাহায্য দ্বারা ভূষিত করেন এবং আরও এগারো বছর আয়ু দান করেন আর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্বীয় রহমত ও স্নেহের ছায়ায় আশ্রয় দান করেন। এ সময় তিনি পাকিস্তানের দূরদূরান্তে বহুবার ভ্রমণ করেন এবং জামা'তের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নামে ইউরোপও সফর করেন এবং ইউরোপিয়ান আহমদী মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এ সময়ের মধ্যেই হুযূর (রা.)-এর কলম দ্বারা লেখা তফসীরে সগীর প্রকাশিত হয় যা বিশ্বের প্রচলিত সকল তফসীরের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই অনন্য রচনাটি অনেক আভিধানিক, অর্থগত এবং বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক বিষয়াদীতে সমৃদ্ধ ছিল বরং এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ ছিল যা সম্পর্কে পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যমও ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

সে যুগেই কেন্দ্রে জিয়াউল হক প্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর দৈনিক আল্ ফযল করাচীর পরিবর্তে রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এই সময়েই তা'লীমুল ইসলাম কলেজ, আনসারুল্লাহ্‌র কেন্দ্রীয় অফিস, ফযলে ওমর হাসপাতাল, স্মারক মসজিদ, আইওয়ানে মাহমুদ এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় অফিস, জামেয়া আহমদীয়া এবং নুসরাত বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের মনোরম ও সুন্দর সুন্দর ভবন নির্মিত হয়। ওয়াকফে জাদীদ-এর মত বিপ্লব সৃষ্টিকারী তাহরীকের সূচনা হয়। প্রকাশনা বিভাগ 'এদারাতুল মুসান্নেফীন' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এছাড়া এতীম ও মিসকীনদের জন্য নির্মিত 'দারুল ইকামাহ্'ও সে যুগের স্মৃতিচিহ্নই বহন করছে। অনুরূপভাবে রাওয়ালপিণ্ডির মসজিদে নূরের চমৎকার বিল্ডিংটির নির্মাণ কাজও সে যুগেই সম্পন্ন হয়।

পাকিস্তানের বাইরে জামা'তের কর্মকাণ্ডের প্রতি যদি দৃষ্টি দেয়া হয় তাহলে দেখা যায়, সেই স্বর্ণালী ১১ বছরে (অর্থাৎ ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৫ সনের নভেম্বর পর্যন্ত) সুইজারল্যান্ড, লাইবেরিয়া, ফিলিপাইন এবং আইভরিকোস্টে

আহমদীয়া জামা'তের নতুন নতুন মিশন প্রতিষ্ঠালাভ করে। মাল্টার একজন প্রকৌশলী বয়আত গ্রহণ করে নিজ দেশে আহমদীয়াতের পতাকা উড্ডীন করেন। বিশ্বজুড়ে জামা'তের বইপুস্তকের প্রকাশনা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করে। সে সময় সবার কাছে সমাদৃত পবিত্র কুরআনের জার্মান অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ডেনিশ ভাষায় অনূদিত কুরআনের প্রথম খণ্ড ছাপা হয়। এছাড়া অন্য আরও কয়েকটি ভাষায় কুরআনের অনুবাদকর্ম সম্পন্ন হয়।

এছাড়া সে সময় তাহরীকে জাদীদের মুবাল্লিগদের প্রচেষ্টায় বার্মা, লাইবেরিয়া ফিলিপাইন, হামবুর্গ, দারুস সালাম (তাঞ্জানিয়া), কাম্পালা, জিনজা (উগান্ডা), টাঙ্গানিকা, সিয়েরালিওন, আক্রা (ঘানা), রেঙ্গুন (বার্মা), এবং ফিজি'তে জামা'তের মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মাণ করা হয়। এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশে আরও ১৩টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হতেই খোদার কাছ থেকে জেনে ১৯১৩ সনের ২৭শে আগষ্ট খোদার ওপর অগাধ আস্থা রেখে পরম বিজ্ঞতার সাথে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন,

শত্রু যদি আক্রমণ করতে চায় তাহলে করতে দাও

সে (খোদা ছাড়া) অন্যের সাথে বন্ধুত্ব পাতলেও আমি তো খোদার সাথে সখ্য গড়েছি।

হে শত্রু! তুই কি জানিস কার ওপর তুই আক্রমণ করছিস?

তোর কি জানা আছে! আমি কার কলিজার টুকরা?

হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণের পর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) রাবওয়াহ্‌র বার্ষিক জলসায় এই আক্রমণের কারণ সম্পর্কে বলেন, "শত্রু তো তার ধারণা অনুসারে আমাকে শেষই করে দিয়েছিল কিন্তু প্রবাদ আছে, 'রাখে আল্লাহ্ মারে কে'। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ কৃপা ও দয়ায় শত্রুর সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছেন।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, "মোটকথা, একটি বিপদ বা পরীক্ষা এসেছিল আর চলেও গেছে। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা আমাদেরকে এর (ক্ষয়ক্ষতি) থেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এ সময় আমি একথাও বলে দিচ্ছি, যে ঘটনাই ঘটেছে, আক্রমণকারীর উদ্দেশ্য ছিল আমাকে হত্যা করা আর শুধু আমাকে হত্যা করাই নয় বরং আহমদীয়াতকে নস্যাৎ করার গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। আর এটি আমি আমার জন্য ধর্মীয় আবশ্যক দায়িত্বজ্ঞান করি, এ সুযোগে আমি যেন বিশ্বকে জানিয়ে দেই, আমার জীবনের সাথে আহমদীয়াতের উন্নতি নির্ভরশীল নয়। আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন এবং মারাও গেছেন। শত্রুরা মনে করেছিল, এখন আহমদীয়াত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের এই বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয় আর আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতি করতে থাকে। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যুগ আসে আর মানুষ মনে করে তাঁর কারণে আহমদীয়াত টিকে আছে। কিন্তু তিনিও নির্ধারিত সময়ে ইন্তেকাল করেন, এরপরও জামা'ত উন্নতি করতে থাকে। অবশেষে জামা'তের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা আমার হাতে অর্পণ করেন। শত্রুরা ধারণা করেছিল, এই যুবক জামা'তের কী-ই-বা করতে পারবে? আজ নয়ত কাল এই জামা'ত অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু সেই যুবক আজ বয়সের ভারে ন্যূজ হলেও জামা'তের পদক্ষেপ তেজোদীপ্ত যুবকের ন্যায় সম্মুখপানে ধাবমান। কাজেই, আহমদীয়াতের উন্নতির সম্পর্ক বা নির্ভরতা কোন মানুষের ওপর নয়। এটি খোদার রোপিত চারা, যা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নতি করবে আর এর শাখা-প্রশাখা পৃথিবী থেকে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছতে থাকবে।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯২৪ সনের ইউরোপ সফরের সময় একটি নযম রচনা করেছিলেন। সেই মূল্যবান ও তত্ত্বপূর্ণ কবিতার কয়েকটি পঙক্তি দিয়ে লেখাটির ইতি টানছি।

'তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলে ঠিকই কিন্তু কিছুটা চিন্তা তো কর!

কাঁচের টুকরোর হীরক খণ্ডের সাথে কোন তুলনা হতে পারে কী?

খোদার সাহায্য-সমর্থন যদি আমার সঙ্গী না হত

তাহলে তিরের আঘাতে কবেই না তোমরা আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে।

স্মরণ রেখ! আমি সত্য খোদার নিরাপত্তার চাঁদরে আবৃত রয়েছি

তিনিই আমাকে সকল দুর্বলতা থেকে রক্ষা করবেন।'

(সূত্র: আল্ ফযল ডাইজেষ্ট, পৃষ্ঠা: ১৮, লন্ডন থেকে প্রকাশিত আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের সংখ্যা) ... (চলবে)

"পাক্ষিক আহ্‌মদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "পাক্ষিক আহ্‌মদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিকনির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক, পাক্ষিক আহ্‌মদী,**
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশিবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

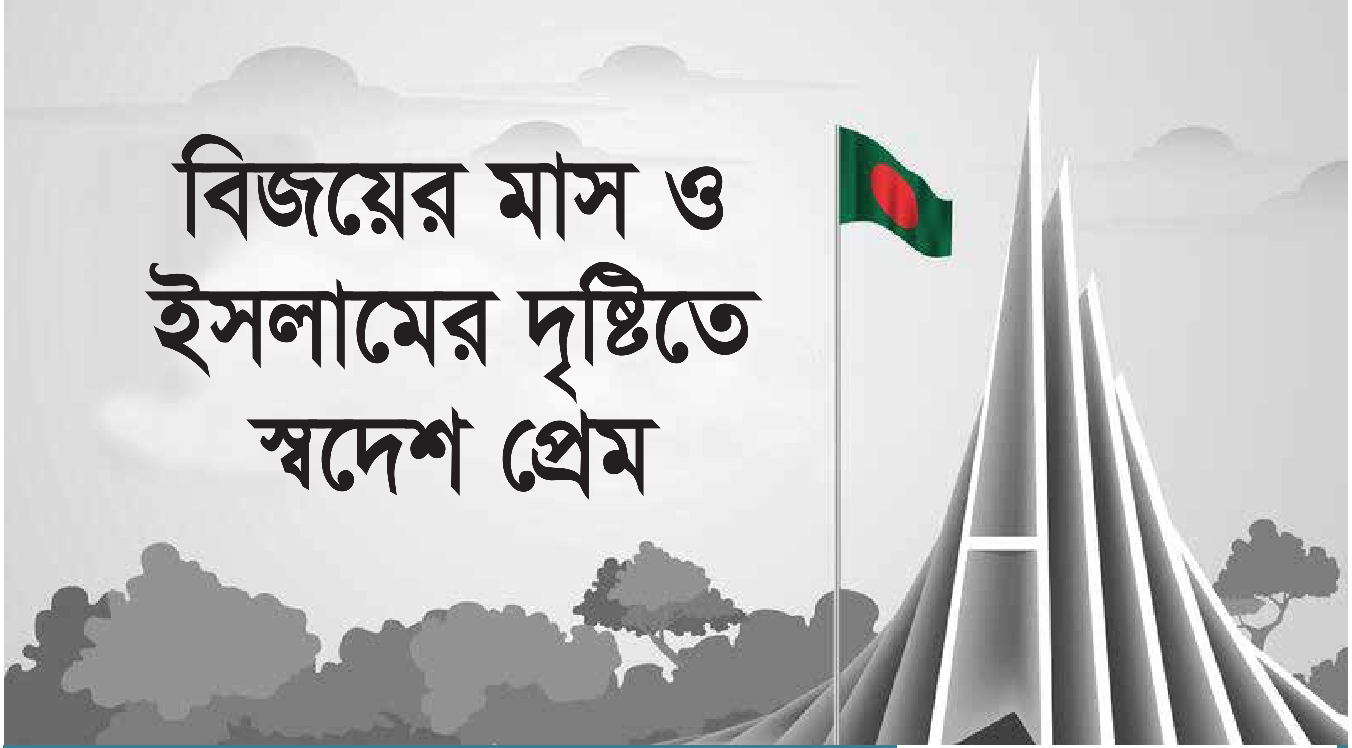

বিজয়ের মাস ও ইসলামের দৃষ্টিতে স্বদেশ প্রেম

মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাঙালি জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বর্বর হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। এরই প্রেক্ষাপটে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। বঙ্গবন্ধুর বজ্রধ্বণিতে বাংলাদেশের ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণী-পেশার মানুষ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে প্রাণ হারায় প্রায় ৩০ লক্ষ বাঙালী এবং সম্ভ্রম হারায় ২ লক্ষ মা-বোন।

স্বদেশপ্রেমী মুক্তিযোদ্ধাদের এই মহান আত্মত্যাগ, কুরবানী, সাহস ও বীরত্বের ফলে আমরা বাঙালি জাতি পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাই। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রায়

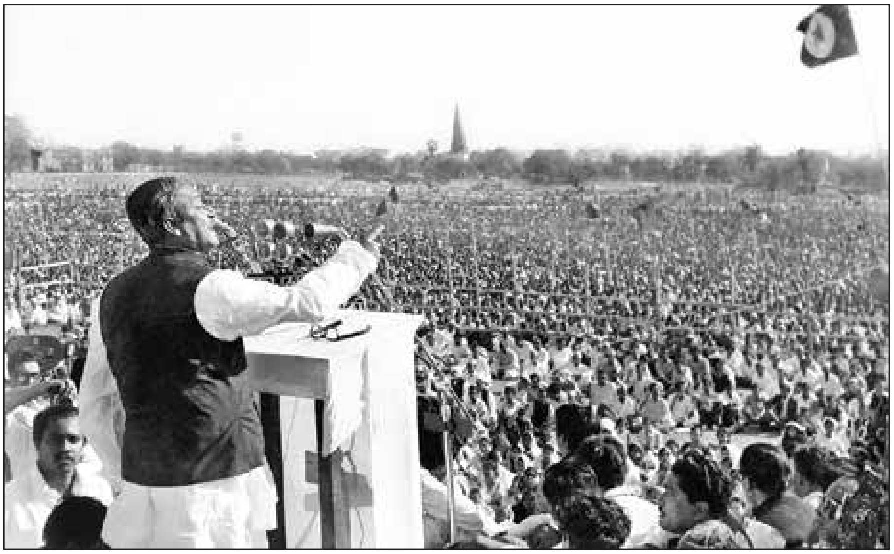

৯১,৬৩৪ সদস্য যৌথবাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। ফলে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অগণিত সদস্যও অংশ নিয়েছেন। গত ৩০ অক্টোবর তাদের মধ্যকার ৬৬ জনকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

দেশের পক্ষে মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধ

দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষায় দেশের পক্ষে যুদ্ধ করা যেমন দেশপ্রেমের অংশ তেমনই এটা মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা সম্মতও। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও নবুওয়্যতের পূর্বে দেশের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তখন তার বয়স ছিল ২০ বছর। এ সময় কুরাইশ

এবং কাবিলা কায়েস-এর মধ্যে যুদ্ধ বাধে। কুরাইশের পক্ষে বনু কিনানা ছিল। আর শত্রুপক্ষের সাথে হাওয়াজিন ছিল। দেশের এই সংকটময় অবস্থায় আমাদের প্রিয় নবী (সা.) সাধারণ সৈন্য হিসেবে যুদ্ধে শামিল ছিলেন। আর নিজের চাচাদের তির কুড়িয়ে দিচ্ছিলেন। *(সীরাত ইবনে হিশাম)*

স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ

ইসলামে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তেমনই দেশপ্রেমকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামে দেশপ্রেমকে ঈমানের অংশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন: **'হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান'** অর্থাৎ দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। *(আল মুকাসেদুল হাসানা, আল্লামা আব্দুর রহমান সাখাবী, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ্)*

স্বদেশের প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালবাসা

নিজ জন্মভূমির প্রতি ব্যক্তি পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যে ভালবাসা ছিল, তা-ও ছিল অসাধারণ। যখন প্রথম ওহী লাভের পর হযরত খাদিজা (রা.) তার চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেল-এর কাছে মহানবী (সা.)-কে নিয়ে যান। তখন ওয়ারাকা সব শুনে অবলীলায় বলে ওঠেন, এই ফিরিশতাই হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে এসেছিল। হায়! আমি যদি ঐ সময় জীবিত থাকতাম যখন আপনার জাতি আপনাকে দেশান্তরিত করবে, তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করতাম। মহানবী (সা.) একথা শুনে অবাক হলেন। ভাবতে পারলেন না যে, তাঁর জাতি তাকে কীভাবে দেশান্তরিত করবে। বললেন, আমার জাতি আমাকে আমার দেশ থেকে বের করবে! এটা কীভাবে সম্ভব? *(সহীহ্ বুখারী)*

তারপর নবুওয়্যতের ১৩ বছর পর একদিন আসলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যেদিন তিনি নিজের জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনা যেতে বাধ্য হলেন। যাত্রাপথে তিনি বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন।

জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট আর বেদনায় তাঁর হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছিল। বেদনা অশ্রু হয়ে চোখ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। যখন এক পর্যায়ে মক্কা দেখা যাচ্ছিল না তখন তিনি এক উঁচু পাথরে দাঁড়িয়ে মক্কার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলেন আর বললেন-

'হে মক্কা ! তুমি আমার কাছে সমস্ত স্থান থেকে অধিক প্রিয়, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার মন তোমাকে ছেড়ে যেতে সায় দেয় না কিন্তু তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে থাকতে দিল না। যদি আমার জাতি আমাকে দেশান্তরিত না করত তাহলে আমি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করতাম না।' *(মুসনাদ আহমদ ও তিরমিযী)*

তাফসিরে কুরতুবিতে বর্ণনা করা হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করছিলেন, তখন তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল।

মহানবী (সা.)-কে জন্মভূমিতে ফেরানোর অঙ্গীকার

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) যখন সওর গুহা থেকে বের হয়ে মদিনার পথ ধরেন, তখন বারবার অশ্রুসিক্ত হয়ে মক্কার দিকে তাকাচ্ছিলেন। তখন তাঁর হৃদয় খুবই ব্যথিত ও বেদনাভারাক্রান্ত ছিল। যার ফলে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ তালা তাঁকে মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার করেন। বলেন,

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

(সূরা কাসাস: ৮৬)

'নিশ্চয়ই যিনি আপনার জন্য কুরআনকে বিধান করেছেন তিনি আপনাকে অবশ্যই জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন।' এ সান্ত্বনার বাণী শুনে তিনি পথ চলতে শুরু করেন আর মদিনা পৌঁছে যান।

মহানবী (সা.) কখনও স্বদেশকে ভুলে যান নি

সত্যিকার দেশ প্রেমিক কখনও তার দেশকে ভুলতে পারে না। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হলেও মাতৃভূমিকে কখনও তিনি (সা.) ভুলেন নি। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত, মক্কা থেকে উসাইল গিফারি (রা.) মদিনায় এলে তিনি (সা.) মক্কার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। তিনি মক্কার অধঃপতিত অবস্থার বর্ণনা শুরু করলে মহানবী (সা.) অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, উসাইল! আমাকে আর কষ্ট দিও না। *(জামিউল আসার, পৃষ্ঠা ২২১২)*

অন্য এক স্থলে বর্ণনাকারী বলেছেন, মক্কা বর্তমানে খুবই শস্যশ্যামল। এর চারণভূমি ইসখার ঘাসে পরিপূর্ণ। এর গাছগুলো ফুলে-ফলে সুশোভিত। একথা

শুনে মহানবী (সা.)-এর মক্কার স্মৃতি স্মরণ হয় আর তিনি (সা.) বললেন, তুমি আমাদের হৃদয় জুড়ালে। *(আল মুকাসেদুল হাসানা, আল্লামা আব্দুর রহমান সাখাবী, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ্)*

স্বদেশের জন্য দোয়া ও সাহায্য প্রেরণ

দেশের বিপদে কোন দেশপ্রেমিক চুপ থাকতে পারে না বা নিরব থাকতে পারে না বরং দেশের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেয়। মহানবী (সা.)ও এমনটিই করেছেন। হিজরতের পর একবার মক্কায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লোকেরা ক্ষুধার জ্বালায় মৃত প্রাণীর হাড় পর্যন্ত খেতে শুরু করে। তারা চোখে পথ দেখছিল না। মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে বড় শত্রু আবু সুফিয়ান তখন মদিনায় আসে আর মহানবী (সা.)-কে তাঁর দেশ ও জাতির দোহাই দিয়ে ফরিয়াদ করে বলে: হে মুহাম্মদ! আপনার জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন যেন বৃষ্টি হয় এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়। মহানবী (সা.) প্রথমে তাকে চেতনা ফিরানোর জন্য বললেন, তুমি তো বড়ই বীর পুরুষ! আমাকে অস্বীকারের কারণে তোমরা দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এ মুহূর্তে কোথায় তোমরা আমার প্রতি ঈমান আনবে অথচ এটা না করে আমার দোয়া দ্বারা তোমরা এ শাস্তি দূরীভূত করানোর জন্য আমার কাছে উল্টো সাহায্য চাচ্ছ! পরক্ষণেই তাঁর (সা.) স্বদেশ প্রেম এতটা উদ্বেলিত হয় যে, তিনি হাত তোলেন আর বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন ফলে বৃষ্টি হয় এবং দুর্ভিক্ষও দূর হয়ে যায়। কিন্তু মক্কাবাসী অবস্থা পরিবর্তনের পর আবার। তারা আবারও শিরক, মূর্তি পূজা ও মুসলমানদের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। *(সহীহ্ বুখারী)*

অন্য বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) এই দুর্ভিক্ষের সময় মদিনা থেকে চাঁদা তুলে ৫০০ দিনার একত্রিত করে মক্কাবাসীদের জন্য প্রেরণ করেন। *(আল মাবসুত লিলসারাখসি, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯২)*

সাহাবায়ে কেরামদের দেশপ্রেম

শুধু তাই নয়, মহানবী (সা.)-এর ন্যায় তাঁর সাহাবীদের হৃদয়েও ছিল স্বদেশ প্রেম।

হিজরতের পর মদিনায় হজরত আবু বকর ও হজরত বেলাল (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁদের মনে-প্রাণে প্রিয় স্বদেশ মক্কার স্মৃতি জেগে উঠেছিল। তাঁরা জন্মভূমি মক্কার কথা স্মরণ করে আবেগ আপ্লুত হয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। মহানবী (সা.) তাঁদের মনের এই ব্যাকুলতা দেখে প্রাণভরে দোয়া করলেন আর বললেন:

‘হে আল্লাহ্! আমরা মক্কাকে যেমন ভালবাসি, তার চেয়েও বেশি মদিনার ভালবাসা আমাদের অন্তরে দান করুন।’ *(সহীহ্ বুখারী)*

পরবর্তীতে এমনই হয়েছে তথা সাহাবীদের হৃদয়ে মদিনার ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে। হযরত উমর (রা.) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তিনি দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ্! আমার মৃত্যু হলে যেন তোমার পবিত্র রসূলের শহর মদিনাতে হয়।”

মহানবী (সা.)-এর দেশপ্রেম দেখেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, ‘আমি খায়বার অভিযানে খাদেম হিসেবে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে গেলাম। অভিযান শেষে তিনি (সা.) যখন মদিনায় ফিরে এলেন আর ওহুদ পাহাড় তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। এটি দেখে তিনি (সা.) বললেন- ‘এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও একে ভালবাসি।’ *(সহীহ্ বুখারী)*

অনুরূপ কথা মহানবী (সা.) মদিনার ক্ষেত্রেও বলেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, মদিনা আমাদের ভালবাসে, আর আমরাও মদিনাকে ভালবাসি।

মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবাদের এ দোয়া, এ বক্তব্য যে তাঁদের দেশের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও দেশপ্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল কা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত আহমদীদের স্বদেশ প্রেম

আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় বিশ্বের সর্বত্র আজ আহমদীরা ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশের প্রতি একই ভালবাসা ও দেশপ্রেমের আবেগ হৃদয়ে ধারণ ও লালন করে। পাকিস্তানের আহমদীদের একটি ঘটনা। পাকিস্তানী আহমদীদের দেশপ্রেম নিয়ে কেউ প্রশ্ন উঠালে এর উত্তরে সাহেবযাদা মির্যা মোজাফফর আহমদ

সাহেব বলেন, "আমার মনে আছে। একবার ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান আমাকে বলেছেন, কেউ যদি চিৎকার করে শত শত বারও বলে আহমদীরা দেশের বিরোধী, আমি এতে এক সেকেন্ডের জন্য বিশ্বাস করব না, কেননা ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় এক ভয়ানক মিশনের জন্য ১০ জন লোককে প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল। তাদের বলা হয়, এটা ভয়ানক মিশন। এতে জীবিত ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকবে শতকরা দশভাগ আর মরার সম্ভাবনা শতকরা নব্বইভাগ। দেশের জন্য এটা করতে হবে। তখন সর্বপ্রথম এতে যিনি হাত উঠিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য। অতএব তারা দেশের শত্রু, এটা কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য!

স্বদেশ প্রেমের এই একই আবেগ ভারতের আহমদীদের জন্যও প্রযোজ্য আর অন্যান্য দেশের আহমদীদের জন্যও প্রযোজ্য। তারাও তাদের দেশের জন্য একই আবেগ ও ভালবাসা রাখে। তারাও প্রয়োজনে নিজের দেশের জন্য নির্দ্বিধায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

বাংলাদেশের আহমদীদের স্বদেশ প্রেমের আবেগ

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে দেশপ্রেমের এই আবেগ হৃদয়ে ধারণ ও লালন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আহমদীরা কোন ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৯৭১ সালে শত শত আহমদী জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীনতার জন্য মরণপণ যুদ্ধ করেছেন এবং অনেকে প্রাণ দিয়েছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও স্বদেশ প্রেমের একই উদ্দীপনা ও প্রেরণায় তারা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও তারা এ যাত্রা অব্যাহত রাখবেন।

বাংলাদেশের আহমদীদের দেশপ্রেমের বিষয়টিও স্বীকৃত একটি বিষয়। গত ৩০ অক্টোবর ৪ নং বকশি বাজারে

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে আয়োজিত এক সম্মাননা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখক ও কলামিষ্ট এবং একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সভাপতি আবীর আহাদ বলেন, "বাংলাদেশে অনেক ইসলামী দল বা সংগঠন রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মুক্তযোদ্ধাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, বরং পাওয়া যাবে রাজাকার, আল বদর, আল শামস প্রভৃতি মানবতা বিরোধী ও পাকিস্তানী দালাল। পক্ষান্তরে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তেই রয়েছে এতজন মুক্তিযোদ্ধা এবং এখানে কোন রাজাকার নেই।"

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, "এই (আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত) একমাত্র ইসলামী দল যেখানে এত অধিক সংখ্যায় মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে! অন্যদিকে যারা ভিন্ন ইসলামী দল করেন, রাজনীতি করে বেড়ান, যাদেরকে বড় গলায় আওয়াজ করতে দেন, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতাই করেছিল। আপনাদের আহমদী জামা'ত সবসময়ই জ্ঞানী-গুণী মানুষে ভরপুর, এছাড়া আপনারা চিন্তাশীল ও শিক্ষিত। আজকে আমরা আফ্রিকাতে যে ইসলাম দেখি সেটা কাদের অবদান। তা মূলত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অবদান।" (মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে আয়োজিত সম্মাননা অনুষ্ঠান, ৩০ অক্টোবর ২০২১ ইং, স্থান: ৪ নং বকশি বাজার, ঢাকা)

ঢাকা দক্ষিন সিটি করপোরেশনের ২৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ড. উমর বিন আব্দাল আজিজ বলেন: "দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। ইসলামের এই অমোঘ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য মুসলিম ফিরকার মত আহমদী ফিরকার মুসলমানগণও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।"

(মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে আয়োজিত সম্মাননা অনুষ্ঠান, ৩০ অক্টোবর ২০২১ ইং, স্থান: ৪ নং বকশি বাজার, ঢাকা)

স্বদেশ প্রেমের প্রেক্ষিতে দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্বদেশ প্রেমের এই দাবি দেশের উন্নয়ন ও দেশ গড়ার ক্ষেত্রে নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে অবদান রাখার বিষয়টিও আমাদের শিক্ষা দেয়। পবিত্র কুরআন পাঠে স্বদেশের জন্য গভীর টান ও মায়া-মমতার বিষয়টি হযরত নূহ (আ.), হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.)সহ অনেক নবী-রসূলের জীবনাচরণেও লক্ষ্য করা যায়।

হযরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহ্-প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে মক্কায় অবস্থান করতেন। কাবাঘর পুনর্নিমাণ ও মক্কাকেন্দ্রিক দাওয়াত প্রচারের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি যখন মক্কায় বসবাস করতেন এবং পরবর্তীতে তাঁর বংশধরদের সেখানে বসতি স্থাপনের জন্য ছেড়ে এসেছেন তখন তাঁর চিন্তা-চেতনা, দোয়া ও প্রার্থনায় এ জনপদের প্রতি গভীর ভালবাসা ব্যক্ত হয়েছে। কুরআনে তাঁর এমন একটি দোয়ার উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ
مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

(সূরা আল বাকারা: ১২৭)

'হে আমার প্রতিপালক! এ নগরীকে নিরাপদ রাখুন এবং এর অধিবাসীদের ফলমূল দ্বারা রিজিক দান করুন, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে।'

নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হল, আমরা যে দেশে অবস্থান করি, যে দেশে জন্ম নিয়েছি, আমরা যে দেশের নাগরিক, সে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য, সে দেশের সমৃদ্ধির জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে, দোয়া করতে হবে, প্রয়োজনে নিজের সর্বস্ব নিয়োগ করতে হবে।

যুগ-খলীফার আহবান

আমাদের প্রাণ প্রিয় খলীফাও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ইং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের বক্তৃতার প্রাক্কালে দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। হুযূর (আই.) বলেছিলেন-

"অন্যান্য দেশের আহমদীদের মত বাংলাদেশের আহমদীদেরও আবশ্যিক দায়িত্ব হল, তারা যেন সবার আগে স্বদেশবাসীর প্রাপ্য অধিকার আদায় করার চেষ্টা করে। আর এ চেষ্টা এক গভীর উদ্বেগের সাথে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এদের জন্য নিয়মিত দোয়া করুন।"

[১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, হুযূর (আই.)-এর বক্তব্য, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবর্ষ উপলক্ষ]

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের এক তুলনা

আপনারা সবাই জানেন, বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নশীল সম্ভাবনাময় একটি দেশ। এদেশ ক্রমবর্ধমান উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গত ১০ বছরের মাঝে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে দেশের শান্তি নিরাপত্তা, অবকাঠামো ও রাস্তা নির্মাণ, ব্যবসা-বানিজ্য, অর্থনীতি সব ক্ষেত্রেঅনেক পিছনে ফেলে চলে এসেছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের এক টাকা পাকিস্তানের ২ রুপীরও বেশি। অথচ ১০ বছর আগে এ দৃশ্য উল্টো ছিল। বাংলাদেশ আজ খুব দ্রুত ভারতকেও পিছনে ফেলে যাবার স্বপ্ন দেখছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের এ ব্যবধানের অনেকেই অনেক পর্যালোচনা করছেন। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হল, একটি দেশ যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে উগ্র মৌলবাদ ও উগ্র ধর্মীয় সন্ত্রাসকে কঠিন হস্তে দমন করেছে। ফলে তারা সব সূচকে ওপরের দিকে যাচ্ছে। আরেকটি দেশ উগ্র মৌলবাদের কাছে নতিস্বীকার করেছে, পরাজয় বরণ করেছে ফলে তারা অবনতির পর অবনতির দিকে যাচ্ছে।

হুযূর (আই.)-এর দিকনির্দেশনা

আর এ কথাই আমাদের প্রাণ প্রিয় খলীফা তাঁর ৮ বছর আগের ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ইং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে যা বলেছিলেন সেটা আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনার মত কথা। তিনি (আই.) বলেছিলেন:

"দেশ ও জাতির প্রতি ভালবাসার দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের আহমদীদেরকে স্বদেশবাসীকে অবগত করা প্রয়োজন। আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই বিরোধিতা শুধু এই জামা'ত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আগামীতে এরাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে। শুধু তাই নয়, দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে এরা হুমকিস্বরূপ।"

এ বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করা দরকার। দেখবেন, চিন্তা জগতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। আমাদের হুযূর ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ইং এ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন আর মাত্র দুই মাস পর ৫ই মে শাপলা চত্তরের ঘটনা ঘটে। যা দেশের সার্বভৌমত্বকে সত্যিকার অর্থে চ্যালেঞ্জ করেছিল। শাপলা চত্বর ও বাইতুল মোকাররমের সেই হেফাযতি তাণ্ডব ও নারকীয়তার কথা সবারই জানা আছে। উক্ত ঘটনা আমাদের প্রিয় হুযূর (আই.)-এর পবিত্র মুখ নিসৃত আশঙ্কাকে সেদিন অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছিল।

আমি আবারও হুযূর (আই.)-এর বক্তব্যে ফিরে আসছি। তিনি (আই.) আরও বলেন: "আমরা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসার প্রেরণায়, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলছি, এসব উগ্রপন্থিদের কবল থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে এখনই কার্যকর পরিকল্পনা হাতে নিন।"

এখানেও আমাদের একটু থামতে হবে, চিন্তা করতে হবে। মাত্র ৮ বছর আগে আল্লাহ্‌র খলীফা এ কথা

বলেছিলেন। তখন একটা দেশ উগ্র মৌলবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা সময়মত নিয়েছিল আর আরেকটি দেশ নিতে পারে নি। ফলে দুই দেশের মাঝে উন্নতির এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এক দেশ দিন দিন আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখছে আর আরেকটি অতল গহ্বরে যাচ্ছে।

হুযূর (আই.) আমাদের দায়িত্ব স্মরণ করাতে গিয়ে সেদিন আরও বলেছিলেন, "হে বাংলাদেশের আহমদীরা! বিরুদ্ধবাদীদের এসব ঘৃণ্য অপচেষ্টায় তোমরা ভীত হয়ো না, নিরাশও হয়ো না। বিরোধিতার এই ঝড়োহাওয়া তোমাদেরকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে এবং আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্য প্রদানের জন্য প্রবাহিত হচ্ছে। এ সুযোগকে কাজে লাগাও। পূর্বের চেয়ে আরও বেশি আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে উপলব্ধি কর। মহানবী (সা.)-এর প্রেমে আগের চেয়ে বেশি বিলীন হয়ে যাও। জাগতিক সকল সম্পর্কের ঊর্ধ্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ভালবাসাকে প্রাধান্য দাও। কেননা, এগুলো তোমাদের ইহকাল ও পরকালকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে দিবে। এ যুগে তোমাদের পক্ষ থেকে ত্যাগ-তিতীক্ষার যে বিরল উদাহরণ সৃষ্টি হচ্ছে এগুলো বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। নৈরাশ্যকে নিজেদের ধারেকাছেও ভিড়তে দিয়ো না। এক নবউদ্যমের সাথে তোমরা নিজ-নিজ দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা কর! আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন। আপনাদের সকল সৎ উদ্দেশ্যে সফল করুন। দেশের অনিষ্টকারী ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের এবং ক্ষতিসাধনকারী অন্যান্য অপশক্তিগুলোকেও নিঃশেষ করার উপকরণ সৃষ্টি করুন যেন দেশের উন্নতি অব্যাহত থাকে।"

এখানে একটু চিন্তা করতে হবে। দেখুন, হুযূর (আই.) যেমন দোয়া করেছেন, ঠিক তেমনই হয়েছে, এখনও হচ্ছে। একটি দেশ যুগ-খলীফার আন্তরিক দোয়া নিয়ে নিয়েছে। দোয়া পেয়ে গেছে। আর বিপদের পর বিপদের মধ্যেও উন্নতির দিকে যাচ্ছে।

হুযূর (আই.) আরও বলেন: "দেশবাসীর কাছে আপনাদের দেশপ্রেম এবং আপনাদের প্রকৃত মুসলমান হবার বিষয়টি যেন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশের আহমদীয়াতের এই দ্বিতীয় শতাব্দি সীমাহীন কল্যাণ ও মঙ্গল বয়ে আনুক। আল্লাহ্ করুন এমনই যেন হয়।"

হুযূর (আই.) সেদিন আমাদের দায়িত্ববোধ স্মরণ করাতে গিয়ে আরও বলেছিলেন: "ধর্মের উদ্দেশ্যে আজ কেবল আহমদীরাই জীবন, সম্পদ ও সময় বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশে অথবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ বা অঞ্চলে যতদিন এসব কুরবানী দেয়ার প্রয়োজন হবে– আহমদীরা তা দিতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।"

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ সেবার পাশাপাশি ধর্মসেবারও সুযোগ লাভ করি।

কবিতা

ভ্রম

মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম মণি

লা-ইলাহা কালেমা পড়ে, মুসলিম তুমি হও,
ঐ কালেমায় সাক্ষ্যদানে, কাফের আমায় কও?
নামায, যাকাত, হজ্জ, রোযা, মেনেছি মাহদী,
মসজিদ ভেঙে, হত্যা-খুনে, হয়েছ কি জিহাদি?
খাতামান্নাবীঈন মুহাম্মাদে, অসীমতায় এই মন,
উর্ধ্বাকাশে ঈসা প্রাণে বসে, বিশ্বাসী তুমি কেমন?
অযাচিত খোদায় সতত আমি, আরজ-গুজারি,
বেশভূষা তব লৌকিকতায় ভরা, জগৎ পূজারি
ভাল-মন্দের শুদ্ধ জ্ঞানে, শরীয়ত ঈমানে আমি,
হালাল হারামে নাহি ভেদাভেদ, পাচ্ছ খাচ্ছ তুমি
ওয়াজিবুল কতল ফতোয়া মোরে, জাহান্নামী কাফের,
ক্ষণিক ভাবো কোন সনদে, পেরোবে তুমি আখের?
সবাই কাফের নিজে মু'মিন, ফতোয়াবাজির খেলা,
খোদার ওপর খোদকারি করে, জমায়েছ ভবে মেলা।

****

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফুলবাড়িয়ায় সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৮/১১/২০২১ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফুলবাড়িয়ার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট আলহাজ্জ শহীদুজ্জামান। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

উক্ত সীরাতুন্নবী (সা.) জলসায় বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মাওলানা শামসুদ্দীন আহমদ মাসুম, ড. শাহজাহান কবির রতন, মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল আমিন এবং মোহতরম আনোয়ার উদ্দীন মাহমুদ। বক্তৃতার শেষে মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল আমিন প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন। বয়আত পরিচালনা করেন মোহতরম ইমতিয়াজ আলী। আল্লাহ্‌র রহমতে উক্ত সীরাতুন্নবী (সা.) জলসায় ৬জন বয়আত করেন। উক্ত আয়োজনে ৮৫জন ও ৪০জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন।

আলহাজ্জ শহীদুজ্জামান, প্রেসিডেন্ট, ফুলবাড়িয়া জামা'ত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আশুলিয়ায় তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৩ ডিসেম্বর, ২০২১ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমু'আ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আশুলিয়ার উদ্যোগে বিশেষ তরবিয়তী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সরকার, প্রেসিডেন্ট আ.মু.জা. আশুলিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জোনাল ইনচার্জ মাওলানা মুহাম্মদ রাসেল সরকার।

সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব ইউনুস দেওয়ান। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কুরআন পাঠের ফযিলত ও বাহিরে বিয়েশাদীর বিষয়ে জামা'তের শিক্ষা– এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন স্থানীয় মাওলানা সজিব আহমদ। এরপর বাজামা'ত নামাযের গুরুত্ব– এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জোনাল ইনচার্জ মাওলানা রাসেল সরকার সাহেব। সবশেষে সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সরকার। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫জন আহমদী পুরুষ, ১৪জন আহমদী মহিলা এবং ০১জন মেহমানসহ মোট ৩০জন উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

***মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সরকার**, প্রেসিডেন্ট, আশুলিয়া জামা'ত*

ওয়াকফে আরযীর রিপোর্ট

১১/১১/২০২১ তারিখ হতে ১৯/১১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত হোসনাবাদ জামা'তে ওয়াকফে আরযী করেন মাওলানা আমীর হোসেন এবং নায়েব ন্যাশনাল আমীর জনাব শাহানশাহ আজাদ জুম্মান। বৃহস্পতিবার রাতে তারা সেখানে পৌঁছান। তাদের যাওয়ার পর ফজরের নামাযের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। ২০জন থেকে সর্বশেষ ৪০জন তাহাজ্জুদ নামাযে এবং ফজরে উপস্থিত হয়। স্থানীয়রা ক্লাসও করেন। হোসনাবাদ, বানিয়াজান, সরিষাবাড়ী জামা'তের সদ্য বয়আতকৃতগণ ও হারানো সদস্য উদ্ধারকল্পে তারা পকেট সফর করেন এবং একটি হালকা মসজিদও সফর করেন। এলাকার স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ প্রেসক্লাবে সাংবাদিক ভাইদের সাথে তারা মতবিনিময় করেন। এছাড়া তাহাজ্জুদ নামায, তালীমী পরীক্ষা, বৃক্ষরোপণ ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। জুমুআর নামাযে নায়েব আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে সকলের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

***মাওলানা আসাদুজ্জামান রাজীব**, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ*

মজলিস আনসারুল্লাহ্ পুরুলিয়ার প্রথম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০৬-০৭ নভেম্বর ২০২১ইং তারিখ মজলিস আনসারুল্লাহ্ পুরুলিয়ার প্রথম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় যয়ীম জনাব ইছাহাক আলী মোল্লা। কুরআন তিলাওয়াত করেন মাওলানা শামসুল ইসলাম এবং নযম পরিবেশন করেন জনাব আব্দুল জব্বার। এরপর ইজতেমার গুরুত্ব ও কল্যাণ– এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মাওলানা আব্দুর রহমান, মোয়াল্লেম, পুরুলিয়া। সভাপতির পক্ষে উদ্বোধনী ভাষণ ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মুহাম্মদ মজিদুল ইসলাম, সেক্রেটারি ইজতেমা কমিটি। সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বাজামা'ত তাহাজ্জুদ ও ফজর নামায আদায়ান্তে এক কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতা হয়। এরপর সকাল ৭:৩০ মিনিট থেকে ১:১৫ মিনিট পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিযোগিতা এবং খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়। ২:৩০ মিনিট থেকে ৫:৩০ মিনিট পর্যন্ত পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ইছাহাক আলী মোল্লা, যয়ীম আনসারুল্লাহ্, পুরুলিয়া। এরপর কুরআন তিলাওয়াত করেন প্রথম স্থান অধিকারী জনাব আব্দুল জব্বার, নযম পরিবেশন করেন দ্বিতীয় স্থান অধিকারী জনাব নুরুল ইসলাম দেওয়ান। মালী কুরবানীর ফযিলত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মাওলানা শামসুল ইসলাম, মজলিস আনসারুল্লাহ্ পুরুলিয়ার প্রতি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পুরুলিয়ার প্রত্যাশা– এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব হাফিজুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পুরুলিয়া। নামাযের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রিস আহমদ, মোয়াল্লেম দিঘাপাতিয়া। বার্ষিক রিপোর্ট পেশ এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মুহাম্মদ মজিদুল ইসলাম, সেক্রেটারি ইজতেমা কমিটি। সমাপনী ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ, আহাদনামা পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন জনাব সভাপতি সাহেব, যয়ীম আসারুল্লাহ্, পুরুলিয়া। ইজতেমায় আনসার ১৮জন, খোদ্দাম ০৮জন ও আতফাল ০৬জনসহ মোট ৩২জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ মজিদুল ইসলাম, সেক্রেটারি ইজতেমা কমিটি

মজলিস আনসারুল্লাহ্, মহারাজপুর-এর উদ্যোগে প্রথম বার্ষিক ইজতেমা ২০২১ অনুষ্ঠিত

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ মজলিস আনসারুল্লাহ্ মহারাজপুর-এর উদ্যোগে প্রথম বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। রাতে তাহাজ্জুদ প্রোগ্রাম ছিল। এরপর ফজর নামায ও দরসে কুরআন প্রদান করা হয়। সকালের নাস্তা শেষে উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৯:৩০ ঘটিকায়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যয়ীম হাফেজ গাজী মনসূর আহমেদ। কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ সময় পুরুলিয়া মজলিসের জনাব মুহাম্মদ মজিদুল ইসলাম সাবেক মোয়াল্লেম ও ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মহারাজপুর জামা'ত জনাব আমীর মাহমুদ ভূইয়া উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল কুরআন তিলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, দ্বীনি-মালুমাত, খেলাধূলা। সকল আনসার এতে অংশগ্রহণ করেন। এরপর বাদ জুমুআ দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। অতঃপর ছিল সমাপনী অধিবেশন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ইছাহাক আলী মোল্লা, যয়ীম পুরুলিয়া মজলিস। জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, মোয়াল্লেম পুরুলিয়া ও জনাব আব্দুর রহিম নাজিরপুর মজলিস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার প্রদান শেষ হলে আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এ অনুষ্ঠানে ১৪জন আনসারসহ সর্বমোট ২৮জন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রথম ইজতেমায় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম (অবসরপ্রাপ্ত)।

এনামুল হক রনি, চেয়ারম্যান
প্রথম বার্ষিক ইজতেমা-২০২১, মহারাজপুর

কটিয়াদি-কিশোরগঞ্জ জামা'তে বার্ষিক জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৮ অক্টোবর ২০২১ রোজ শুক্রবার সদর সাহেবের সম্মানিত প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী নায়েব সদর ও কায়েদ উমুমী সাহেবের সভাপতিত্বে দোয়া, পতাকা উত্তোলন ও আহাদ পাঠের মাধ্যমে ১৭তম জেলা ইজতেমার উদ্বোধনী কার্যক্রম শুরু হয়। বাদ জুমুআ বেলা ৩টায় উদ্বোধনী অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রব খন্দকার। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব মোখলেছুর রহমান। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জেলা নাযেম আলা জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। নসিহতমূলক বক্তৃতা করেন মাওলানা মাসুদ আহমদ। আনসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন কেন্দ্র থেকে আগত সদর সাহেবের সম্মানিত প্রতিনিধি জনাব ফজল-ই-ইলাহী। বক্তৃতার পর প্রতিযোগিতা পর্ব শুরু হয়। উক্ত প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন ৩জন মুরব্বী সিলসিলাহ্ যথাক্রমে জনাব মাওলানা মাসুদ আহমদ বিপ্লব, মাওলানা মুকুল সরকার এবং মাওলানা নাঈম সাহেব। খেলার পর ১৫মিনিট বিরতি দিয়ে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

শ্রবণ ও মাগরিব এশা নামায একত্রে পড়ার পর সাংগঠনিক আলোচনা হয় এবং এরপর খাওয়া শেষে সবাই নিদ্রা যাপনে যায়। ভোর ৪:২০ ঘটিকায় তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামায হয় ৫:৩০ ঘটিকায়। নামাযে ইমামতি করেন মাওলানা মাসুদ আহমদ বিপ্লব। পরিদিন ৯ অক্টোবর রোজ শনিবার সকালে হালকা নাস্তা আপ্যায়নের পর প্রতিযোগিতা পর্ব শুরু হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন মুরব্বী সিলসিলাহ্ জনাব মাওলানা মাসুদ আহমদ বিপ্লব, মাওলানা মুকুল সরকার এবং মাওলানা নাঈম।

যোহর ও আসর জমা করে পড়ার পর সমাপনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি হিসেবে আসন গ্রহণ করেন কেন্দ্র থেকে আগত মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী। আরও আসন গ্রহণ করেন নায়েব সদর কায়েদ উমুমী মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী, জনাব মোহাম্মদ গোলাম কাদের, নায়েব সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ ও জেলা নাযেম আলা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব রুহুল আমীন। উক্ত ইজতেমায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে প্রথম স্থান অধিকারকারী জনাব কারী ফজলুল হক কুরআন তিলাওয়াত করেন। নযমে প্রথম স্থান অধিকারকারী জনাব মোখলেসুর রহমান উর্দু নযম পরিবেশন করেন। সম্মানিত সদর সাহেব বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জেলা নাযেম আলা জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। তরবিয়তী বক্তৃতা করেন সদর সাহেবের সম্মানিত প্রতিনিধি নায়েব সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ জনাব গোলাম কাদের। আরও বক্তৃতা করেন জনাব ফজল-ই-ইলাহী, এডভোকেট জনাব আজিজুল হক, প্রেসিডেন্ট রুহুল আমিন ও জনাব এম. এ. হান্নান। সম্মানিত সভাপতি সদর আনসারুল্লাহ্ আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। আহাদনামা পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, কিশোরগঞ্জ জেলার ইজতেমায় ৭টি মজলিস থেকে ১০০জন আনসারের মধ্যে ৭৮জন আনসার উপস্থিত ছিলেন। মহান আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ইজতেমার কল্যাণ ও রহমত দ্বারা ভূষিত করুন।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, জেলা নাযেমে আলা
কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ

৪৩তম বার্ষিক স্থানীয় ও জেলা ইজতেমা, চট্টগ্রাম

গত ২২ ও ২৩ অক্টোবর ২০২১ ইংরেজি রোজ শুক্র ও শনিবার দু'দিনব্যাপী মজলিস আনসারুল্লাহ, চট্টগ্রামের ৪৩ তম স্থানীয় ও জেলা ইজতেমা ২০২১ চট্টগ্রামের মসজিদ বাইতুল বাসেত-এ অনুষ্ঠিত হয়। ২২ অক্টোবর শুক্রবার ভোর ৪ টায় বেদারী পরবর্তী তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযের মাধ্যমে ইজতেমা কার্যক্রমের শুভ সূচনা করা হয়। জাতীয় পতাকা ও মজলিস পতাকা উত্তোলন করা হয় ঠিক সকাল ১০:০০ ঘটিকায়। পতাকা উত্তোলন পর্বে উপস্থিত ছিলেন মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশের সম্মানিত সদর, নায়েব সদর-উমূমী, স্থানীয় আমীর, রিজিওনাল নাজেম আলা এবং জেলা ও স্থানীয় মজলিসের শতাধিক আনসার সদস্যবৃন্দ। উপস্থিত আনসার সদস্যদের চট্টগ্রাম মজলিসের সৌজন্যে টুপি ও মাস্ক সরবরাহ করা হয়।

ইজতেমার উদ্বোধনী পর্ব সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশের সম্মানিত সদর জনাব আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলওয়াত করেন মোহতরম মোজাফফর আহমদ নিজামি, নযম পেশ করেন মোহতরম গিয়াসউদ্দীন আহমেদ। বক্তব্য পর্বের শুরুতে স্ব স্ব মজলিসের রিপোর্ট পেশ করেন মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের মোন্তাযেম উমূমী ও জেলা নাযেমে আলা সাহেবান। পরবর্তীতে সভাপতি সাহেবের বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্বোধনী পর্ব সমাপ্ত হয়।

প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বাদ জুমুআ বেলা ৩:০০ ঘটিকায়। সদর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলওয়াত করেন মোহতরম মহিউদ্দীন খান, নযম পেশ করেন মোহতরম মোহাম্মদ ইসমাইল। এই পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নায়েব সদর ও উমূমী কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী। আলোচনা পর্বের শুরুতে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন ইজতেমা কমিটি ২০২১-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব এডভোকেট জহুরুল হক আনসারী। এছাড়া তরবিয়তীমূলক বক্তব্য রাখেন মজলিস আনসারুল্লাহ, চট্টগ্রামের যয়ীমে আলা জনাব এম আরিফ উজ্জামান। শেষ পর্যায়ে সদর সাহেব মজলিসে আম পরিচালনা করেন। বিকাল ০৫:০০ ঘটিকায় ইজতেমায় আগত আনসার সদস্যদের নিয়ে আউটডোর গেইম অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ অক্টোবর, রোজ শনিবার সকাল ৯:০০ ঘটিকার সময় ইনডোর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইজতেমার দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। আগত আনসাররা কুরআন তিলাওয়াত, নযম, বাংলা বক্তৃতা ও দ্বীনি-মালুমাত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়।

দু'দিনব্যাপী ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় দুপুর ৩:০০ ঘটিকায়। এই অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন সম্মানিত সদর আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী মোহতরম হাফেজ নেজাম উদ্দীন, নযম পেশ করেন নযম প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী

মোহতরম এস এম শহীদুল্লাহ্। বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী, স্থানীয় আমীর মোহতরম খালেদুর রহমান ভুঞা, রিজিওন নাজেম আলা এম এ ফয়েজ, মুরব্বি সিলসিলাহ্ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী ও জেলা নায়েমে আলা আলহাজ্জ শাহাবুদ্দীন শিহাব। সবশেষে সভাপতির ভাষণ, ৮জন প্রবীণ আনসারদের বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান, আকর্ষণীয় পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ২দিনব্যাপী ৪৩তম বার্ষিক স্থানীয় ও জেলা ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে খাদ্য বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন হাবিবুর রহমান ফাহিম সাহেব।

মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হেলাল, মোন্তাযেম উমূমী
মজলিস আনসারুল্লাহ, চট্টগ্রাম

রমযান মাসে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত সম্পন্নকারী মিরপুর-এর আনসার সদস্যদের শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে পবিত্র কুরআন প্রদান

মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর-এর উদ্যোগে চলতি বছরের রমযান মাসে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত সম্পন্নকারী ৬০জন আনসার সদস্যদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। মিরপুর জামা'তের আমীর মোকাররম আলহাজ্জ মোহাম্মদ গোলাম কাদের তিলাওয়াত সম্পন্নকারী আনসার সদস্যদের কাছে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে পবিত্র কুরআন প্রদান করেন। এ ছাড়াও মজলিস-এর উত্তমকর্মী এবং আনসারুল্লাহর লিখিত পরীক্ষায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

আবু জাকির আহমদ, যয়ীমে আলা, মিরপুর

শোক সংবাদ

১

আরও একজন নিবেদিতপ্রাণ আহমদীর প্রয়াণ

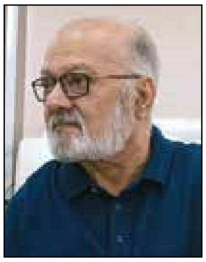

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের নিবেদিতপ্রাণ সদস্য জনাব বশির উদ্দিন আফযাল আহমেদ খান চৌধুরী গত ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুমের পিতার নাম জনাব আলী কাশেম খান চৌধুরী এবং মাতা জনাবা আমাতুর রহমান কিশওয়ার সাহেবা। তিনি ১৯৫৩ সালের ৩১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেক্রেটারি সানাত ও তেজারাত এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুরের নায়েব আমীর হিসেবে সেবা করে যাচ্ছিলেন। মরহুমের মৃত্যুতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আহমদীরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের বিদেহী আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দিন।

পাক্ষিক 'আহমদী' নিউজ ডেস্ক

২

আমার আম্মা গত ২১ নভেম্বর ২০২১ তারিখ সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তিনি মোহাম্মাদ জাহিরুল হক, নিলফামারী হালকা জামা'তের সাবেক প্রসিডেন্ট সাহেবের সহধর্মিণী এবং নায়েব ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান সাহেবের ছোট বোন ও ইন্টারনাল অডিটর বাংলাদেশ জি.এম. মজনুর রহমান সাহেবের শাশুড়ি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন ছেলে ও তিন মেয়েসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গিয়েছেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি অত্যন্ত সহজ, সরল ও নেক ছিলেন। তার আত্মার মাগফেরাতের জন্য জামা'তের সকল ভাইবোনের নিকট বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ রিয়াদ হক
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নীলফামারী (হালকা)

৩

বাংলাদেশের প্রবীণ আহমদী মরহুম মির্জা আলী আখন্দ সাহেবের স্ত্রী হালিমা খাতুন গত ২৪ শে অক্টোবর ২০২১ রাত ১১:৩৫ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৯০ বছর। মরহুমা একজন মুসীয়া ছিলেন এবং জীবদ্দশায় তিনি তাঁর হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করে গেছেন। মরহুমা একজন দানশীল ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যুগ খলীফার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। বিশেষ করে তিনি হুযূর (আই.)-কে দেখার জন্য সব সময় MTA'র সামনে বসে থাকতেন। কটিয়াদী উপজেলার বেতাল গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে স্বামীর কবরের পাশে তার লাশ দাফন করা হয়। তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাতের জন্য আমরা সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মো: আখতারুজ্জামান
মরহুমার জামাতা

ময়মনসিংহ ও সোহাগী জামা'ত সফর করে এলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ মোহতরম আলহাজ্জ আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

গত ৭ ডিসেম্বর ২০২১ ভোর পৌনে ০৫টার দিকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ মোহতরম আলহাজ্জ আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী নিজ কাফেলাসহ ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং সকাল ৭:৫৫ ঘটিকায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের গাড়ি ময়মনসিংহ মিশন হাউজের বড় গেইট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর ন্যাশনাল আমীর সাহেব সরাসরি নির্মাণাধীন মসজিদ ভবনের ছাদে উঠেন এবং বলেন, আশু তৃতীয় তলার ছাদের ঢালাই দিতে হবে। এরপর দ্বিতীয় তলায় মহিলাদের জন্য উঁচু দেয়াল কোথায় তুলতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেন।

অতঃপর দ্বিতীয় তলার পশ্চিম দিকের কাজ নকশা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা– সে বিষয়ে যাচাই করেন। এছাড়া মেহরাবের জায়গা কতটুকু হবে এবং মেহরাবে ভেন্টিলেশন কীভাবে হবে– সে বিষয়ে বুঝিয়ে দেন। এরপর স্থানীয় আমেলার সাথে মিটিং করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে দোয়া পরিচালনা করেন। দুপুরের নামাজ পড়ান ময়মনসিংহ মসজিদে। এরপর কেন্দ্রীয় কাফেলা দুপুর ২:০০ ঘটিকায় সোহাগী জামা'তের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

উল্লেখ্য, প্রায় চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর আগ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের নামায আদায়ের জন্য আকুয়া মহল্লায় একটি আধাপাকা টিনসেড মসজিদ ছিল। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব গত রমজানে তিন তলা মসজিদ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। বর্তমানে দ্বিতীয় তলার কাজ শেষ পর্যায়ে এবং তৃতীয় তলার কাজ চলমান। নিচতলা সামাজিক বিভিন্ন কাজের জন্য এবং বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য উন্মুক্ত থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় থাকবে নামাযের ব্যবস্থা। তৃতীয় তলায় প্রায় ২০০জন এবং দ্বিতীয় তলায় প্রায় ২০০জন একত্রে নামায আদায় করতে পারবেন। মহিলাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থাপনায় পৃথক নামাযের ব্যবস্থা থাকবে।

মহান সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদ্‌যাপন

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ কাফেলা বিকাল ৩:৪৫ ঘটিকায় সোহাগী জামা'তে গিয়ে পৌঁছায়। ন্যাশনাল আমীর সাহেব জামা'তের সকলের সাথে কুশল বিনিময় করার পর জলসাগাহ পরিদর্শন করেন এবং কুরআন ক্লাসের ছাত্র ছাত্রীদের সাথে আনন্দঘন কিছু সময় কাটান আর তাদের চকলেট উপহার দেন। এছাড়া কুরআন ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের সুচারুরূপে পাঠদান করায় জনাব এস. এম. মাহমুদুল হক মোয়াল্লেম সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বাদ মাগরিব এস. এম. মাহমুদুল হক মোয়াল্লেম সাহেবের পরিচালনায় সিরাতুন্নবী (সা.) জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব হলুদ মিয়া। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সোহাগীর প্রেসিডেন্ট ডা. আব্দুল হান্নান সাহেব ।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ময়মনসিংহের নির্মাণাধীন মসজিদ ভবন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সোহাগীর টিনসেড মসজিদ

ময়মনসিংহে নির্মাণাধীন মসজিদ ভবনে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল

এরপর 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় জীবনাদর্শ'– এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মুরব্বি সিলসিলাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। আল্লাহ্‌র কৃপা এবং ঐশী কল্যাণ লাভের উপায়– এ বিষয়ে মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ মোহতরম আলহাজ্জ আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী। তিনি বক্তব্যের মাঝে বলেন, আমাদের প্রিয় নবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) দিনের পর দিন রাতের পর রাত পাহাড়ের গুহায় গিয়ে খোদা তা'লার প্রতি প্রেম নিবেদন করেছেন, খোদার ভালবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র প্রতি কত গভীর ভালবাসা রাখতেন। তিনি আরও বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাকারী। একদা তিনি (সা.) গাছের নিচে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শত্রু তরবারি হাতে নিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-এর গলায় ধরে জিজ্ঞেস করে, এবার বল আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? তিনি (সা.) জবাব দিলেন, আমার আল্লাহ্। এই উত্তর শুনে শত্রুর হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। অতএব আমরাও যদি আল্লাহ্‌র সাথে নিবিড় সম্পর্ক রচনা করতে চাই তাহলে আমাদের জন্য আদর্শ হল, মহানবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। বক্তৃতা শেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়া পরিচালনা করে জলসার প্রথম অধিবেশন শেষ করেন এবং ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে সফর সঙ্গী আরও হিসেবে ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারি জায়েদাদ জনাব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্, মাওলানা রবিউল ইসলাম এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ময়মনসিংহের প্রেসিডেন্ট সাহেবসহ বেশ কয়েকজন।

জলসার দ্বিতীয় পর্বে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম– এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্। এরপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে নামাযে এশা আদায় এবং রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। উক্ত জলসায় ময়মনসিংহ এবং ধানিখোলার আহমদীগণও অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সিরাতুন্নবী (সা.) জলসায় ৭৫ জন আহমদী এবং ৩০ জন অ-আহমদী অতিথি অংশ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ০২জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের ছায়ায় আসার সৌভাগ্য লাভ করেন। অনুষ্ঠানের সকল কার্যক্রম মাইকের মাধ্যমে প্রচার করা হয় ফলে প্রায় দুই হাজার লোক উক্ত জলসা শুনে উপকৃত হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

পাক্ষিক 'আহমদী' নিউজ ডেস্ক

পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহ্‌মদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org**

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক থেকে সে বিরত থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপদৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

৩

খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনাব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং নিজ পাপসমূহের জন্য প্রত্যহ ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

৪

প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষকরে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনভাবে অন্যায় কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

৬

সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করবে।

৭

অহঙ্কার ও দম্ভ সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

১০

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ তথা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্বন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্ক ও বন্ধনে অথবা তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ: ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ইং)

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

হুওয়াশ্ শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. (Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200

২. Chelidonium Q (Mother tincture)

বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।

২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।

২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

ডা. রবিউল হক, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْئٍ خَادِمُک رَبِّ فَاحْفَظْنِیْ وَانْصُرْنِیْ وَارْحَمْنِیْ

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

New Vol. No. 84 | 11th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th December, 2021 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

MTA-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

MTA-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) **শুক্রবার:** বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০** সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার **রাত ১০:২০** এবং **ভোর ৪:০০**।

(২) **শনিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সকাল ৮:১০** এবং **বিকাল ৫:০০**।

(৩) **রবিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০**।

(৪) **বৃহঃবার:** একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **রাত ৮:০০**।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা **হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)**-এর কতিপয় বক্তৃতা ও পত্রের সংকলন-এ

"বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ"

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ (ইংরেজি পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ প্রকাশ করেছে।

পুস্তকটির অনুবাদের কাজটি করেছেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক। প্রথম সংস্করণের অংশে আরো যাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তা প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বর্ণিত আছে। বইটির অনুবাদ, কম্পোজ, সম্পাদনা, প্রুফ-রিডিং, মুদ্রণ প্রভৃতি কাজে সম্পৃক্তদের আল্লাহ্ তা'লা উত্তম পুরস্কার দান করুন। নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE, YOU NEED -

* DIGITAL MARKETING STRATEGY
* PROMOTIONAL VIDEO
* FACEBOOK PROMOTION
* PRODUCT PHOTOGRAPHY
* PRODUCT VIDEOGRAPHY

STUDIO JUNCTION ENTERTAINMENT REIMAGINED

Find us on STUDIOJUNCTIONBD

Dental Care

ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি
বি. ডি. এস (ঢাকা),
পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, **মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭**

ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন

চেম্বার ঃ
ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী
১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাম্প সংলগ্ন),
পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সাক্ষাতের সময়:
বিকাল ৫টা - রাত ৯টা (মঙ্গল - শুক্রবার)

সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)